★ উ প ন্যা স ★

# পাগলিনি রাধা

## অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রুমালি শুয়ে আছে।
সাদা চাদরে ঢাকা তার শরীর।
শীত চলে যাচ্ছে। বসন্ত সমাগমে হলুদ রঙে ছাপানো শাড়ির মতো কী যেন ইচ্ছেরা ঘোরাফেরা করছে তার শরীরে। এই সকালে, যখন ভোর হয়, হয় না, আবার জানালার পাশে একটা ঘুঘু পাখি উড়ে এসে বসে, তার কেন যে তখন মনে হয় শরীর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসে, এবং মনে হয় স্বপ্নের মতো আকাশ যখন নীল তখন উঠে বসা যায়, কারণ সে জানে, ঠিক এই সময়ে কেউ যায়—হাতে ঝকমকে পেতলের ক্যান, গায় হাফশার্ট, হাফপ্যান্ট পরনে—তার পা থেকে উরুর মাধুর্য তাকে জাগ্রত করে—তখনই সে স্বপ্নটার কথা মনে করতে পারে—
কারওর যেন প্রশ্ন, আচ্ছা এই বাড়িটায় কি তিনি এসেছিলেন, অনশন করেছিলেন, এখানে কে আর থাকে!
কেন আমি থাকি!
আর কেউ থাকে না!
থাকে, তোমার কী চাই বল তো?
আমার! সজলের মুখ আরও মায়াবী হয়ে যায়।
না বলছিলাম, এত বেলায় কেউ ঘুমায়!
আচ্ছা বিপদ, রুমালি চাদর সরিয়ে উঠতে লজ্জা পায়। তার রাতের পোশাক বড়ই হালকা, যেন কোনও পাখিয়ালা তার পাখির ডিমের খোসা দিয়ে পোশাকটি তৈরি করে দিয়ে গেছে—এত হালকা, এত মসৃণ যে ভোরের বাতাসকেও সে লজ্জা পায়। কারণ চাদর সরালেই পা থেকে জংঘা পর্যন্ত একেবারে খালি। শুধু সোনালি রঙের প্যান্টির আড়ালে যে থাকার, সে আছে। অদ্ভুত ইচ্ছারা তার খেলা করে শরীরে। সে বালিশ দিয়ে মুহূর্তে স্তন আড়াল করে দেয়।
তুমি সরো, আমি উঠব। এটা তো রাস্তা নয়। এ দিকে এলে কী করে!

আর তখনই রুমালি দেখতে পায় সেই নবীন যুবক দ্রুত আমলকি গাছটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। গাছটায় বৃষ্টির ফোঁটা চাপা হয়ে গিয়ে সবুজ সব চিড়ে ভাজা হয়ে জড়িয়ে আছে ডালে।

রুমালি চেয়ে থাকে।

সে চলে গেলেই রুমালির হুঁশ হয়, সে খাট থেকে নেমে পড়ে এবং ওর হাই ওঠে—তার পরই চোখ যায় আমলকি গাছটার গোড়ায়। সেখানে সে দেখতে পায়, গাছতলায় খুঁজছে কিছু ছেলেটা।

রুমালির রাগ হয়। জানালার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসার পথে সে কী খুঁজে বেড়ায় আমলকি গাছের নীচে! রুমালি নিজের শরীরের দিকে তাকায়।

সে যায়, সে যে তাকে চুপি চুপি দেখে যায় তাও টের পায়।

একতলা এই বাড়িটায় মেলা ঘর। কোন ঘরে কে থাকে বোঝা মুশকিল। এটা অবশ্য তার একার ঘর। হুকাদাদু, থাকে তার পাশের ঘরটায়। তার পরের ঘরটায় টুকিপিসি, সেই তাদের রান্নাঘর সামলায়। টুকিপিসির বর আসে রাত করে। বাগানের ভেতর দিয়ে সেই বর মানুষটা পালিয়ে যেন বাড়িটায় ঢোকে। কেবল সেই এক রাতে টের পেয়েছে, টুকিপিসি বরের জন্য খাবার গোপনে তুলে রাখে। সে জানে হুকাদাদু টের পেলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে দেবেনকে। চোর, ইতর, বলে গালাগাল দিতে পারে।

এই টুকি।

আজ্ঞে যাই।

কী হচ্ছে।

না, কাকা, কিছু হচ্ছে না।

দেবেনের এত সাহস! পালিয়ে সে এ বাড়িতে থেকে যায়। এ বাড়িতে খায়। তোর সঙ্গে শোয়।

টুকিপিসির মুখ দেখলে রুমালির তখন কেমন কষ্ট হয়। হুকাদাদু দেবেনকাকাকে তক্তপালে, কিংবা তেড়ে গেলে টুকিপিসি মাথা নিচু করে রাখে।

আসলে দেবেনের বড় ছাড়চড়া স্বভাব। পিসির সঙ্গে দেবেনের কী সম্পর্ক সে আগে জানত না। দেবেন তো আগে ফুচকা বিক্রি করত রাসমণি বাজারে। কখনও নস্করদের বাড়ির সামনে। পিসির সঙ্গে বেড়াতে বের হলে, এই যেমন খাল ধারে, হাড়গোড়া কলের চিমনিও দেখা যায় সেখানে গেলে, ঘুরে ফিরে, কারণ এই চাউলপটি রোডের পেছনের দিকটা ঝিলের মতো এবং কচুরি পানায় ভর্তি, মাঝে মাঝে ডাঙা, ডাঙায় যে যার মতো, নস্করবাড়ির সরকারবাবুকে বলে ঝুপড়ি তুলে বসবাস করছে। আর কী সাহস ছেলেটার এবং দেবেন যেমন পালিয়ে পাঁচিল টপকে বাড়ি ঢোকে, এবং সামনের ফুলের বাগানে গন্ধরাজ ফুলের গাছটার নীচে উবু হয়ে বসে থাকে, এবং রাতের ছায়া ছায়া অন্ধকারে, কারণ রাস্তার আলো গাছগুলোর মাথায়, বারান্দার আলোও কিছুটা উৎপাতের কারণ হয়—কারণ আলোয় গাছের মাথা সাফ দেখা যায় তবে গাছের নীচে কী আছে বোঝা যায় না, কারণ গাছের নীচেও অন্ধকার। দেবেন যে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকে কেউ টেরই পায় না।

হাফপ্যান্ট হাফশার্ট গায় হাতে দুধের ক্যান নিয়ে পাঁচিল টপকে বাড়ি ঢোকে। সেই ছেলেটা, যে মাঠ পার হয় বড় রাস্তায়, খাটালের দিকে যায় দুধ আনতে, এবং আমলকি গাছটার নীচে ইতিউতি তাকায়— রুমালিই প্রথম টের পেয়েছে।

রাস্তার কল থেকে ছেলেটা জলও নেয়।

গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, কালো ঢোলা বারমুডা পরে যখন সে যায়, রুমালি না তাকিয়ে পারে না। কোনও তরুণ সে। কলেজে পড়ে— কখনও কখনও কলেজ যাবার পথে বাড়ির পাঁচিল টপকে যায়। অবশ্য বাস ধরার তাড়া না থাকলে সে চৌহদ্দি দেওয়া বাড়িটায় ঢোকে না।

তখন সরকার বাড়ির মাঠই সম্বল। দু'টো জারুল গাছের নীচ দিয়ে সে চলে যায়। সরকার বাড়ির মাঠে সে হনহন করে হাঁটে। সরকার বাড়ির মাঠ ধরে গেলে বাস ধরার রাস্তাটা বেশ দূরপথ হয়ে যায় এটা রুমালি ভালই বোঝে।

এবং একজন সুন্দর তরুণ যুবক যখন এই বাড়ির রাস্তাটা চিনে ফেলেছে, এবং হয়তো এই আধপরিত্যক্ত বাড়িটার সব খবরই সে রাখে, না রাখলেও যে কোনও ক্ষতির কারণ আছে এখন ভাববার কারণ নেই, রাখলে ভাল না রাখলে আরও ভাল—তবে বাড়িটায় গাছপালা, পাখি, প্রজাপতির জন্য উঠতি বয়সের ছোকরা-ছুকরিদের বেশ একটা আকর্ষণ।

এমন নিরিবিলি গাছগাছালির ভিতর ঘুরে বেড়াতে কার না ভাল লাগে! রাস্তা থেকে বাড়িটাকে পরিত্যক্ত ভাবাও যেতে পারে। আধপরিত্যক্ত অথবা কিছু গৃহভৃত্যের বাসও ভাবা যায়। তবে রুমালির সাধুসন্তদের কথাই বেশি মনে হয়, কেউ তীর্থক্ষেত্রে রওনা হওয়ার আগে অথবা পথেপ্রবাসে বের হয়ে পড়ার আগে এই গৃহকোণে সামান্য ক্ষণের জন্য জপতপের অপেক্ষায় ছিল—বাড়িটার কথা চোখ বুজে ভাবলে এমনও মনে হয় তার।

সবুজ মাঠ পার হলেই আমলকি গাছ দিয়ে বনজঙ্গলের শুরু। লিচু গাছ, আম, জাম, জামরুল গাছও আছে, এমনকী শেষ দিকটায় একটি বিশাল বাঁশঝাড়ও আছে। হুকাদাদুর কাজই গাছপালার পরিচর্যা, জঙ্গল সাফ করা। বর্ষার দিনে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে বলে, বাড়িটার চার পাশে কার্বলিক অ্যাসিডও তিনি ছিটিয়ে দেন।

তবে বাড়িটার আসল রহস্য যে সে নিজে। সে আয়নার সামনে দাঁড়ালে এটা বেশি টের পায়। টিকউড দিয়ে তৈরি তার কারুকাজ করা খাট। সিংহের থাবা বসানো খাটের পায়াতে। দেয়াল জুড়ে বিশাল জার্মান আয়না। এত বড় যে সে কখনও জাড়িয়াটা খুলে আয়নার সামনে বসে থাকে। এবং শরীরের রহস্য এত পুষ্ট নিয়ে আয়নায় ধরা দেয়, যে তার স্তন পাকা বেলের মতো আশ্চর্য কুয়াশায় ডুবে যায়।

সে যে বড় হয়ে যাচ্ছে, আয়নায় দাঁড়ালে যথেষ্ট টের পায়। লজ্জাও হয়। নিজেই দু' হাতে ঢেকে শরীর আড়াল করার চেষ্টা করে, আমলকি বনে ছেলেটাকে দেখলেই কেন যে নিজেকে এত বেশি দেখতে ইচ্ছে করে। এবং এই বাড়ির মধ্যে তার হাঁটাচলার বিশেষ এক ছন্দ আছে। জানালায় কিংবা বারান্দায় সে যখন অন্যমনে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে এবং মুগ্ধ হয়ে যায়—বাঁচার এক তীব্র জ্যোৎস্না খেলা করে বেড়ায়।

বারান্দায় একা বসে থাকলে হুকাদাদু খেপে যায়।

আবার দিদিমণি তুই এখানে।

কী হয় এখানে বসলে।

তোকে বলেছি না, একা কোথাও যাবি না, একা মাঠে বনজঙ্গলে হাঁটবি না! বারান্দায় বসবি না।

হাঁটলে কী হয়!

কী হয় বোঝাই কী করে, যা যা ভিতরে যা, পাগলামি করিস না।

না যাব না।

তোর ঘাড় যাবে।

তুমি দাদু এমন কেন কর বল তো!

এই দুঃখপ্রসাদ, দ্যাখ রুমালি আবার পাগলামি শুরু করেছে। হা করা বারান্দায় একা বসে আছে।

দুঃখপ্রসাদ ছুটে আসবে, নেই মাইজি, ঠিক নেহি। আপ অন্দর মে চলা যাইয়ে।

দুঃখপ্রসাদের গোঁফজোড়া কথা বললে নড়ে ওঠে। সে যে এই বাড়িটার পাহারাদার টেরই পাওয়া যায় না। সারাদিন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাবে। সারারাত জেগে থাকলে, দিনদুপুরে তার ঘুম তো পাবেই। পেল্লাই চেহারা, এক হাতে একটা গণ্ডারকে সে জলে চুবিয়ে মেরেছে। কথার গুরুত্ব না দিলে সে ভাবে দিল্লাগি হচ্ছে। বাইরের লোকেরা, কেউ এই সীমানায় অনুপ্রবেশ ঘটালেই রণহুঙ্কার—কুম্ভকর্ণের মতো গদা হাতে থাকলে তাকে মানাত ভাল। কাউকে ঢুকতে দেখলেই হা হা করে তেড়ে যাবে। সাহস কি কাকপক্ষী ওর চোখের আড়ালে ঢুকে যায়।

তবে ঢুকে যায়।

দুঃখপ্রসাদ মনে করে, না ঢুকে যায় না। এক বার তো এক অন্ধ ভিখারিকে বারান্দায় সারাদিন আটকে রাখল— না বলে ঢুকেছে, ঢুকেছে বলে খুব একটা ক্ষতি নেই, তা বলে অন্ধ সেজে বসে আছে। লোকটা যে গুপ্তচর নয়, লোকটা যে রুমালির খোঁজখবর নিতে আসেনি—রুমালিকে এই বাড়িতেই বাবুজি গোপনে রেখে দিয়েছেন, টের পেলে ঢাকসুদ্ধ বিসর্জন। সবার নকরি খতম।

তখন রুমালি নিজের মনেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসে। বাবুজি তার বাবা হন, এক ঝুমরোয়ালির মেয়ে সে। হুকাদাদু এমনই তাকে বলেছে। বাবুজি ঝুমরোয়ালিকে খাটাল থেকে তুলে আম্বালায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন। সে জানে তার দাদাজির মেলা কুঠি আছে, ফার্মহাউসও আছে, আর হাটগামারিয়ায় আছে চায়না ক্লের খনি। সবই শোনা কথা। বাবুজির শাদি করা বহুর এক কথা, ঝুমরোয়ালি মরে গেছে, কিন্তু গর্ভবতী হয়েছিল সে, তার পর কী হল! বাবুজির এক কথা, তার পর আর কিছু নাই। কোটিপতি মানুষের ঝামেলার শেষ নাই, কোনখান থেকে কে গজিয়ে উঠবে, সম্পত্তির হিস্যা চাইবে, এই সব সাতপাঁচ ঝামেলার আতঙ্কেই বাবুজি যে তাকে বাংলা মুলুকে রেখে বড় করে তুলেছেন, এমন কানাঘুষো কথাবার্তা তার কানে উড়ে এসেছে।

এ সব কারণে রুমালির নানা আতঙ্ক। বাবুজির শাদি করা বহুর মতলবটা কী আছে সে জানে না। এই গোলমেলে জীবন থেকে সে আজকাল রেহাই পেতে চায়। গাছপালা পাখির প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা আছে, এই কুঠিবাড়িতে কুকুর-বেড়ালও মেলা, রাত হলেই সাজগোজ সেরে গায়ে আতর মেখে সে ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়, আর প্রতীক্ষা করে, সেই ব্যাগ কাঁধে যুবক কখন ফিরবে!

সরকারবাড়ির মাঠে ফুটবল খেলা হয়, ছাদে দাঁড়িয়ে খেলা দেখার মজাও আলাদা। কিন্তু দিনের বেলায় ছাদে সে যায় না।

কিন্তু আসলে সে দাঁড়িয়ে থাকে তার জন্য। তার ফেরার দৃশ্যটি কেমন দেখতে আজ পর্যন্ত তা সে জানে না।

সকালবেলায় হাফপ্যান্ট হাফশার্ট, কলেজ যাবার সময় সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা হাফশার্ট আর কাঁধে ঝোলা, বইপত্র বোধহয় ভেতরে থাকে।

আজকাল ইচ্ছে করেই রুমালি বেলা করে ওঠে।

সে শুয়ে থাকলে বিশাল আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ভেসে থাকে।

রুমালি জানে সেই লম্বা মতো দারুণ স্বাস্থ্যবান তরুণ আমলকি গাছের ছায়া পার হয়ে তার জানালা অতিক্রম করে খাটাল থেকে দুধ আনতে কিংবা রাস্তার কল থেকে দু' বালতি খাবার জল তুলে নিয়ে যায়— সকাল হলেই সে আসে। দূর থেকেই তাকে না দেখুক, আয়নায় তাকে দেখতে পাবে— এক পরির মতো সুন্দর কিশোরী মেয়ে শুয়ে আছে, রাতের সোনালি গাউন কোমরে উঠে আসে, ফুল ফল ছবি আঁকা প্যান্টির নিচে উরু আর জানু নিয়ে তার শরীর ছড়িয়ে থাকে আয়নার দিকচক্রবালে। এমন কোন সাধুপুরুষ আছে, আয়নার এমন দিশেহারা ছবি অমান্য করে!

রুমালির মাথায় কত কথা যে সব সময় গিজ গিজ করে— কথারা সব যেন কথামালা হয়ে গেঁথে যায় মগজে। মুখে পেস্ট, দাঁতে ব্রাশ, কারণ তার টোস্ট, ডিমের পোচ, কলা সন্দেশ সাজিয়ে টুকিপিসি অপেক্ষা করছে, কখন সে বের হবে বাথরুম থেকে। সাদা ন্যাপকিনে ঢাকা চিনে মাটির ট্রেতে ঠিক সাজিয়ে রেখেছে সব। বের হয়ে ডাইনিং স্পেসে ঢুকলেই টুকিপিসি বলবে, খেয়ে নাও, বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

তার যে খেতে ইচ্ছে করে না।

পিসি! দেবেনকাকা কোথায়!

তোমার কথা আমি কিছু জানি না দিদিমণি।

ঠিক জানো।

খাও। এত কথা বললে খাবে কখন।

এ মা, আমি যে মুখই মুছিনি। মুখে আমার জল লেগে আছে।

ও কিছু হবে না।

সঙ্গেসঙ্গে সে উঠে পড়ে।

সঙ্গেসঙ্গে ফুল্লরা দৌড়ে আসে। ট্রেতে সাদা তোয়ালে। কী যে হয় তার, বাড়িটায় রাতের বেলা কুকুরের চেঁচামেচিতে তার ঘুমই হয়নি। তারও আজ উঠতে বেলা হয়ে গেছে। বাথরুম সাফ হয়নি, বাসি তোয়ালে, জামাকাপড় কিছুই বাথরুম থেকে বের করা হয়নি। বাথরুম থেকে দিদিমণি মুখ না মুছেই টেবিলে এসে বসে গেছে।

হবে না। গজ গজ করছে ফুল্লরা। কেউ কি কিছু লক্ষ রাখে, তার কী দোষ!

সব সময় যত সন্দেহভাজন কথাবার্তা, আর হারামি হুকাবুড়ো যেন যত নষ্টের গোড়া। ফুলের মতো মেয়েটার ওপর এত খবরদারি করলে হয়! দু'দিন বাদে বুড়ো মরবি তুই, বুঝিস কিছু, উঠতি বয়সে মেয়েদের কী হয়! কোথা থেকে আসে এই কুকুরগুলো। সব তো রাস্তার কুকুর। কেউ ঠিক, কোমর সমান উঁচু পাঁচিলের গেট খুলে দেয়। আর আমিষ নিরামিষ উচ্ছিষ্ট খাবার, যার যেমন খুশি খেয়ে যায়। খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করে। তার ঘরের পাশে জলপাই গাছের নীচে একটা টবে সব উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলে দেয় টুকি। আরে কুকুরের দোষ কী। সারাদিন এখানে সেখানে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে, জিভ থেকে লালা ঝরছে, যখন তখন গেট খুলে দিলে হয়।

রুমালি এক গ্লাস হরলিক্স নিয়ে বসে আছে। সে গ্লাসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, ভাবছে, খাবে না ফেলবে—এই ফুলি, গাছতলায় আমলকি খুঁজে পাসনি?

যা ধরা পড়ে গেল বুঝি!

সে আড়ালে কপাল কুঁচকে ডাহা মিছে কথা বলে ফেলল, আসলে সে গাছটার নীচে যায়ইনি।

না, গাছের নীচে আমলকি ছিল না।

ভাল করে দেখেছিস।

দেখেছি তো!

ছেলেটার নাম কী রে!

কোন ছেলেটা!

আরে দেখিস না সকালে খাটাল থেকে দুধ নিয়ে যায়।

ও সজলদা! সজলকুমার।

তোর আবার দাদা হল কবে থেকে! সে তো গাছতলা থেকে আমলকি চুরি করছে। কেন, সে কি আমার কাছে চাইতে পারে না। তার এত অহঙ্কার কীসের।

টুকিপিসি পড়ে গেছে ফাঁপরে। খাচ্ছে না। শুধু কথা বলছে। রাজ্যের কথা তার মুখে।

খাও দিদিমণি।

খাচ্ছি তো!

কোথায় খাচ্ছ!

এই যে খেলাম।

এটাকে খাওয়া বলে!

এই তো খেলাম।

খাও দিদিমণি, তুমি না খেলে, হুকাদাদু শাসাবে—সব ক'টাকে বের করে দেব বাড়ি থেকে, এতটুকুন একটা মেয়েকে সামলাতে পার না! খাওয়াতে এত কষ্ট তোমাদের—তোমরা আছ কী করতে। সরকারি খানা গিলতে লজ্জা করে না! যত সব অকর্মার ধাড়ি। খাবে আর শোবে। দেবেন বেটাকে আবার ধরি, দেখবে মজাটা কত দূর গড়ায়। একটা মেয়েমানুষের লোভে বেটা দুই প্রাণ হাতে করে ঢুকে যাস, তোর এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।

তখনই ফুল্লরার কান খাড়া।

বাসন পড়ার শব্দ।

কেউ কিছু ঠিক চুরি করছে। কে রে—কোথায় শব্দ হল। আরে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বের হয়ে আয়। বাড়িটায় কোথাও কিছু রাখা যায় না। যে যেখান থেকে পারছে সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

তখনই রুমালি চেঁচিয়ে উঠল।

এত গোলমালে খাওয়া যায়! আমি মানুষ তো—আমাকে তোমরা শান্তিতে খেতে দাও না। বাবুজি এলে সব না বলছি তো, দেখবে আমি ফের ঘুমিয়ে পড়ব।

ফুল্লরা বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে কেন, এই তো সবে ঘুম থেকে উঠলে।

ঘুম থেকে উঠলে, ফের বুঝি ঘুমানো যায় না! রুমালি জেদি বালিকার মতো চোখ মুখ বাঁকিয়ে চিৎকার করে উঠল, খিদে পায় না, তবু জোর করে খেতে হবে। ঠিক আটটায় ব্রেকফাস্ট, কেন আগে হতে পারে না, কেন পরে হতে পারে না। কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা আমাকে শেখানো হচ্ছে। আমি কি বোকা, আমি কি কিছু বুঝি না। গাছতলা থেকে কে আমলকি চুরি করে!

টুকিপিসি বলল, এটা অসময় বোকো না। একটা দু'টো আমলকি যে হয় না।—তা বলা অবশ্য উচিত হবে না। ঠিক আছে, আমি দেখছি।

ধুস, তুমি দেখবে। তা হলেই হয়েছে।

এ দিকটায় যখন তখন চেঁচামেচি যতই হোক, কেউ ঢুকতে সাহস পায় না। একমাত্র হুকাদাদু তার ঘর থেকেই চেঁচাতে পারেন, কী হল দিদিমণির! আবার ঘুমিয়ে পড়বে বলছে কেন! ঘুমিয়ে পড়তে দিও না। ডোজ কি বেশি পড়ে গেছে। এই মিনি সিস্টারকে ডাক তো—সে কোথায়।

অ্যাপ্রন পরা নার্স মেয়েটি বসার ঘরে ইজিচেয়ারে পা নাচাচ্ছিল, আর কাগজ পড়ছিল।

নার্স মেয়েটি যথেষ্ট ত্যাঁদড়। সব শুনতে পাচ্ছে। তবে এই সুবিধা, বাড়িটা হ য ব র ল, যার যা মনে হয়, তাই নিয়ে নানা রকমের বচসা হয়। হুকাদাদু নিজে ডোজ মতো আফিং খান, ডোজের বিষয়টাই তার মাথায় খেলা করে। সে মুচকি হেসে জবাব দিতে পারত দিদিমণি কি আর ছোট আছে, তাকে ঘুম পাড়াবার জন্য ওষুধের দরকার হবে কেন! দাদুটা বাড়ির মাথা, তিনিই যদি ভুল বকেন, সাহেবকে সব বলা দরকার, বুঝলেন স্যার, খুকুদিদিমণি কারওর কথা শোনে না। ঘুম থেকে উঠেই বলে, আবার ঘুমাব। খাবার দেখলে রেগে যায়।

আরে বাবা এটাই তো তার রোগ। তুমি বাপু আছ কী করতে! আর মুশকিল, সে যা ভাবে তাই সত্যি, সে যা ভাবতে পারে না তা কখনও সত্য হয় না।

যেমন সামনের ছোট্ট টেনিস মাঠের মতো ছোট্ট ঘাসের জমি পার হলেই আমলকি গাছ।

আমলকি গাছের নীচ দিয়ে কেউ যায়।

সে কে?

খোঁজো তাকে!

হুকাচাচা কী করে!

তিনি তো জানেন মেয়েটার মাথার ওপর অজস্র আপদ। অচেনা লোক পাঁচিল টপকে ঢুকে যায়, দুধ আনতে যায়, রাস্তায় খাবার জল নিতে আসে, বস্তিতে থাকে। বস্তির লোক তো ভাল হয় না। যত সব গুন্ডা বদমাস বস্তিতেই থাকে। পাপতাপের শেষ থাকে না। একটা মেয়ের জন্য এত বন্দোবস্ত, অথচ তাকে তোমরা সামলাতে পারছ না! তা অবাধ্য মেয়ে জানি—ওর তো কোনও দোষ নেই। এ ভাবে এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে তাও ভাবিনি। মদন পাত্রের অর্থাৎ বাবুজির মুখ বিষণ্ণ।

স্যার, একটা কথা বলব।

কেন একটা কথা।

আপনি স্যার এত কথা বললেন, আমি কি একটা কথাও বলতে পারি না।

নিশ্চয় পার।

আমলকি, গাছটা কেটে দিলে হয়।

কেন, কেন, আমলকি গাছটা আবার কী দোষ করল।

গাছটায় কোনওই ফল হয় না।

হয়, তুমি জানো না। আমি নিজে মাঝে মাঝে দেখেছি একটা দু'টো আমলকি পড়ে থাকে।

না বলছিলাম, গাছটায় অজস্র ফল, কিংবা এই যে গাছটা কখনও দিদিমণির কাছে আমলকি বন হয়ে যায়, মাঝে মাঝে রাতে তারা সারা বাড়িময় হাঁটাহাঁটি করে, তার আপনি কী করবেন।

তুমি মিনি কী করতে চাও।

গাছটা কেটে ফেললেই হয়। খুকু দিদিমণির আপদ চোকে।

তিনি ইজিচেয়ারে চোখ বুজে বহু দূরাগত ভাবনার মধ্যে তলিয়ে যাবার সময় বললেন, সে কি আর ছোট আছে, আর কত কাল খুকুমণি করে রাখবে! কুমালি দিদিমণি বলতে পারব না! আর শোনো, এক বার বলেছ, দ্বিতীয় বার বলবে না। গাছ কেটে ফেলতে বলছ। কী দুঃসাহস তোমাদের! গাছটায় কুমালির প্রাণ আছে জানো?

হতবাক হয়ে মিনি নার্স চেয়ে থাকে। মদনলাল পাণ্ডে লম্বা উঁচু মানুষ, চোখ বিস্তৃত, মাথায় অবশ্য সামান্য টাক আছে, চোখে ভারী লেন্সের চশমা, সঙ্গে একটি ইস্পাতের বাক্স, ভিতরে গুরুদেবের ফটো, পুজোর ফুল, যে-ক'দিন থাকেন এই বাক্স তার মাথার কাছে থাকে। সকালে উঠেই, কুমালির কপালে ঠাকুরের পবিত্র ছবিটি স্পর্শ করান, এবং এই বাড়ির বড় বড় দেওয়ালে যেমন দেওয়াল-জোড়া তিনটে সাদা ঘোড়ার ছবি আছে, খাবার টেবিলে লম্বা একটা বেড়ালের ছবি আছে, দেওয়াল জোড়া এমন অজস্র ছবি, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা অর্থাৎ বস্ত্রহরণের ছবিসহ যমুনার জলে স্নানরতা উলঙ্গ গোপিনীদেরও ছবি আছে, কুমরিওয়ালি যখন যা বায়না করেছে, তিনি তাকে সব রকমের ছবিই বিখ্যাত সব শিল্পীদের দিয়ে আঁকিয়ে দেওয়ালে জুড়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে মূল্যবান ছবি হল পূর্ণ চক্রবর্তীর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। রঙে রেখায় এই ছবি যেন বাড়িটায় অন্য মাত্রা যোগ করেছে। দ্রৌপদীর স্তনের ভাঁজ থেকে নাভির গাঢ় অন্ধকার, এবং এ ভাবে নানা ইচ্ছার জগতে ভরে আছে কুমালির এই প্রাসাদ। আমলকি গাছটার বয়স আর কুমালির বয়স এক—কারণ কুমালির জন্মদিনে, তার পিতাঠাকুর বেলেঘাটার এই আশ্রমবাড়ি থেকে টেলিগ্রামে জানিয়েছিলেন, তোমাকে মদন বিশেষ এবং চমকপ্রদ খবর দিচ্ছি, কুমরিওয়ালির এই বাচ্চাটি খুবই পয়া। এখানে প্রাতঃভ্রমণের সময় একটি অঙ্কুরোদ্গমের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। পৃথিবীর যত রূপ রস গন্ধ এই আশ্রমবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, মেয়েটির জন্মের সঙ্গে এই অঙ্কুরোদ্গমের কোথাও যোগ আছে মনে হয়। কে জানে এই প্রাণের কী ইচ্ছে। গাছটাকে রক্ষা করা দরকার। গুরুদেবের ভবিষ্যৎবাণী যথার্থ সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনিই বলেছিলেন, লাঞ্ছিতা নারী কুমরিওয়ালি, তার গর্ভে তোমার পুত্রের বংশধর, অর্থাৎ এই কন্যা তোমার পরিবারের শুভাশুভের প্রতীক। তোমাদের এস্টেটের তিনি লক্ষ্মীরূপী মহীয়সী। এবং এ কারণেই মদন পাণ্ডের বিশ্বাস গাছটি যত ডালপালা মেলে দেবে তত কুমালির প্রাণে উচ্ছ্বাসের বান ডাকবে। গাছটির কোনও ক্ষতি হলে কুমালিরও বিশেষ ক্ষতি হবে।

আর যত গোল পাকিয়েছে মদনলালের বিবাহিত পত্নী অনুরাধা মাঙ্গরী। বিয়ের পরও অবশ্য সে অনুরাধা মাঙ্গরী লেখে। এবং এই পৈতৃক সূত্রে পাওয়া মদনলালের বিশাল এস্টেটের কোনও অংশ হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে জন্য অনুরাধা কিছু চর নিযুক্ত করেছে। কারণ সে জানে কুমরিওয়ালি গর্ভবতী হয়েছিল তবে তার কী পরিণতি সে জানে না। এবং চর সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই নারী কোথায়। তার পর কোথায় মদনলাল পাণ্ডে সেই নারীকে নিয়ে ভেগেছে! অপবাদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, এক জন জিপসি মেয়ের ভালবাসার জন্য এবং পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য তিনি যে কিছু দিন উধাও হয়ে গেছিলেন, সে খবরও রাখে অনুরাধা মাঙ্গরী।

আর অজ্ঞাতবাসের সময় মদনলালের দোসর হুকা সিংহ থাকত পাহাড়ের কোলে। মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের মোট বইত। দেখা হয়ে গেল তাড়া খাওয়া মদনলালের সঙ্গে। জিপসি মেয়ে কুমরিওয়ালি তখনও ঘাঘরা পরে বাবুজির পায়ে পায়ে ঘুরছে।

হুকা সিংহ সব মনে করতে পারে।

আরে ভুলভাল তো মানুষেরই হয়। হুকা সিংহ সেই মদনলালকে গোপনে পিতাঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। অনুরাধার গর্ভধারণের ক্ষমতা কতটুকু তাই নিয়ে যখন যথেষ্ট সংশয় মদনলালের বাবা মধুসূদন পাণ্ডের, তখনই রক্ষিতার গর্ভসঞ্চারের খবর আসে। মধুসূদন নিজে গোপনে বেনারসের বাঙালিটোলায় বাড়ি ভাড়া করে দেন, নিজে চলে আসেন তাঁর বেলেঘাটার আশ্রমবাড়িতে। কারণ চার চারটে বছর অতীত হয়ে গেল মদনলালের বিবাহিত জীবন, অথচ গর্ভসঞ্চারের কোনও লক্ষণই নেই অনুরাধার মধ্যে। এবং যখন কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে আট বছরের কুমালিকে রেখে কুমরিওয়ালি মরে গেল এবং সেই শোকে পাগল মদনলাল, অফিসে বসে না, সারা দিন নদীর পাড়ে বসে থাকে, এবং বিষণ্ণ বোধ করে তখনই ছুটে গিয়েছিল অনুরাধা, স্বামীর কাছে। মদনলাল পাণ্ডে অবশ্য তাকে গ্রহণ করেননি।

এ সব অবশ্য অতীত কথা। সত্য-মিথ্যা কতটা কিংবা গোলমাল হয়ে যাওয়া গল্পে মাথা-মুণ্ডুর কতটা যথার্থ আর কতটা যথার্থ নয় তা এক এক মুখে এক এক রকম শুনলে যা হয় আর কী—তবে বিষয়আশয় বিষ, অনুরাধা, জিপসি মেয়েটির কেলেঙ্কারি পুলিশ এবং আত্মীয়স্বজনদের—কারণ শত হলেও বালিকা অপহরণ সাজা হতেই পারে, এই আতঙ্কে, সম্পত্তির বেশিটাই অনুরাধাকে লিখে দেন। মধুসূদন পাণ্ডে।

সে যাই হোক—আমলকি গাছটির কথাতেই আসা যাক ফের।

এই এই শোনো।

কে ডাকছে!

সজল আনমনে পাঁচিল টপকে যাচ্ছে। হুকা সিংহ তাকে চেনে। সে জলার মধ্যে দ্বীপের মতো একটা বস্তিবাড়িতে থাকে তাও জানে। হুকা সিংহ এবং দুঃখপ্রসাদ তাকে সজলকুমার বলে ডাকে, কখনও বাঙালিবাবু। পাঁচিল টপকে ভিতরে সেই একমাত্র ঢুকতে পারে। কখনও হাতে দুধের ক্যান থাকে।

কখনও তার দু' হাতে বালতি।

তবে তার কেন যে বাড়িটায় ঢুকতে সঙ্কোচ হয়— কারণ জানালা পার হলেই দেখতে পায় এক আশ্চর্য যুবতী। পর্দার আড়ালে ঘোরাফেরা করছে।

খুব তাড়া না থাকলে, অবশ্য সে বাড়িটার ওপর দিয়ে যায় না।

সবে সে এখানে তার এক মামার কাছে উঠে এসেছে। আগে বেতড়ের দিকে থাকত। হাওড়া থেকে বাহান্ন নম্বর বাসে যাওয়া যায়। গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছু তাঁতির সঙ্গে বেতড়ে চলে এসেছিল। তার কলেজের মাইনে বাকি, চার-পাঁচ মাসের ওপর হবে, সে মাইনে দিতে পারছিল না। বাবারও ক্ষমতা নেই। কলোনিতে দু'টো বাহারি ঘর করে জঙ্গল সাফ করে কোনও রকমে বসবাস করছেন তারা। ভাইবোন মিলে সাতজনের সংসার।

নিরুপায় বাবা এ দেশে এসে আর কী করেন! দেশভাগের সঙ্গেই তার বাবা-জ্যাঠারা এ দেশে চলে এসেছেন। দেশে বাবা একা থাকতেন কী করে! নিমতলার আড়তে খাতা লেখার কাজটি পেয়ে যাওয়ায় কোনও রকমে, দু'বেলা না হোক একবেলার অন্তত অন্নসংস্থান করতে পেরেছেন। এ হেন অবস্থায় কলেজের মাইনে বাকি বললেই দেবেন কোত্থেকে! কলোনির কিছু সমবয়সি আবার কিছু বয়স্ক লোকও তার সঙ্গে বেতড়ে এসেছিল।

তারা যাচ্ছে হাওড়ায় ফুরনে তাঁতের কাজ নিয়ে, গ্রীষ্মের ছুটি যখন, আর কলেজ কামাই করলেও বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, যদি বাড়তি কিছু টাকা রোজগার হয়, সেই আশাতেই বেতড়ে চলে এসেছিল সে। এই প্রথম সে মা-বাবা, ভাইবোনদের ছেড়ে অচেনা জায়গায় উঠে এসেছিল। দু' মাসের মজুরিতে তার বহরমপুর কলেজের মাইনেটা অন্তত হয়ে যাবে।

তবে সব জায়গাই শেষে চেনা হয়ে যায়। থাকতে থাকতে জায়গাটির প্রতি ভালবাসাও তৈরি হয়। বেতড়ে সে তার বন্ধুবান্ধব মিলে ভালই ছিল। তবে গোল বেধেছে, ফুরনে কাজ, প্রতি দিন চল্লিশ গজ ব্যান্ডেজের কাপড় বুনতে না পারলে মাস শেষে তার চল্লিশ টাকা মজুরি মিলবে না। মজুরি না পেলে, তার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

তার পর বাধ্য হয়ে সবাই মিলে ঠিক করে ফেলল— সজল মেসের রান্নার দিকটা সামলালে সবাই চাঁদা করে মাসে চল্লিশটা টাকার অন্তত ব্যবস্থা করতে পারবে। দু' মাসে কলেজের বাকি মাইনেটা হয়ে যাবে। হুকা সিংহ এবং দুঃখপ্রসাদকে সজল কথায় কথায় সব বলেছিল।

এখন যে সে তার মামার কাছে যাবে তারা তাও জানে। কিছু চল দেখে কলেজ স্ট্রিটে তার রোজগার আছে তাও জানে। ছেলেটা কত কষ্ট করে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে, এটাই হুকা সিংহের গর্বের বিষয়।

সোজা কথা, এত পরিশ্রম, এত খাটা, এবং বোধহয় এই যে তাকে রাস্তার কল থেকে সকালে দু' বালতি খাবার জল নিয়ে যেতে হয়, যখনই দেখে, কেউ না কেউ হয় বাজারে না হয় মামা-মামির ফুটফরমাসে ব্যস্ত থাকে। বড় কঠোর তার মামি। মামার আবার একটা ঠ্যাং খোঁড়া। কাশীপুর গানসেলে কাজ করে—যত ক্ষণ ছেলেটা বাড়িঘরে থাকে শুধু কাজ আর কাজ। পড়ার সময় পায় কখন!

এই এক অনুমাননির্ভর জীবন সজলকে হুকা সিংহের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

দেখা হলেই এক কথা, ব্যাটা লড়ে যা।

তবে যাই হোক, সে অনুরাধা ম্যাডামের চর নয়, কারণ এই বাংলা মুলুকে বড় হুজুরের যে মোকাম আছে, তাই জানে না বহুরানি। বড় হুজুর বুকে তুলে মানুষ করেছিলেন রুমালিকে। রক্ষিতার মৃত্যুতে পুত্রের তো এক সময় স্বার্থী হবার মতলব ছিল। অসহায় একটি প্রাণ, এবং গুরুদেবের আজ্ঞায় রুমালিকে বড় করে তোলার জন্য এতই বিভোর ছিলেন তিনি, কারণ তিনি জানেন, এই আশ্রমবাড়িতে এবং কিছু দূরে গেলে সেই বাড়ি, গাঁধীজি নোয়াখালির রায়টের শান্তি কামনায় এক সময় এই অঞ্চলে অনশন করেছিলেন—সেটা ছিল পরাধীন ভারতের মুক্তির কাল, একটা শিশু অবহেলার শিকার হবে, পরকাল আছে, পরকালে এই অপরাধের যে ক্ষমা নেই, এই সব ভেবেই তিনি এমন একটি সুবন্দোবস্ত করে গেছেন এবং পিতার মৃত্যুর পর মদনলালও তাকে বুকে তুলে নিতে দ্বিধা করেননি। রুমালি অবৈধ সন্তান হলেও, সে বংশের একমাত্র কন্যা। রুমালি তার মায়ের মুখ পেয়েছে। ছিপছিপে মেয়ে সুন্দরী হলে কী হয় এবং যৌনতায় ঝুমরিওয়ালি পাগল হয়ে যাবে, মদনলালকে নানা ভাবে গানে নাচে কখনও ঘাঘরা তুলে, কখনও উদু হয়ে যৌনতায় বিভোর করে রেখেছিল। এবং জীবনের মাধুরী মিলিয়ে এই ফুর্তির মতো তার ঝুমরিওয়ালি ছিল নদীর জলের মতো নিরন্তর ধাবমান। তার স্মৃতি এতই মধুর যে মাঝে মাঝে সব কাজ ফেলে রুমালির কাছে না এসে পারেন না।

এই এই শোনো।

সজল চার পাশে তাকাচ্ছে, কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ তাকে কেউ যেন ডাকছে। অতি প্রত্যুষে সে দুধ আনতে যাচ্ছে। মামার গাঁজা-ভাঙের অভ্যাস আছে। দুধের ব্যবস্থা না থাকলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন।

সজল বুঝেছে, মামা তাকে রেখেছেন আসলে মামিকে কিছুটা পাহারা দেবার জন্য। মামার নাইট ডিউটি। রাতে মামি একা থাকেন, তা ছাড়া যে বটতলায় ত্রিনাথের মেলা বসে, মামার সাকরেদরা জড় হয়, মেলার ত্রিনাথের যশো-গানের সঙ্গে গঞ্জিকা সেবন, শনিবার শনিবারে রেসের মাঠে যাবারও অভ্যাস আছে। আর গাঁজা-ভাঙ খেলে চেলা চামুণ্ডারও অভাব থাকে না। মামার ভয় মামি একা থাকতে থাকতে সুযোগ বুঝে না আবার দুশ্চরিত্রা হয়ে যায়। শত হলেও বিয়ে করা বউ। চেলা চামুণ্ডারও অভাব নেই। এহেন মামাটির সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা সে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। হাওড়ার পুলে সহসা দেখা হয়ে গেলে মামা একেবারে বিগলিত।

আরে সজল!

সেও খুব অবাক। কলকাতায় তার কিছু আত্মীয়স্বজন যে আছে সে জানে। তবে সে এখনও কারওর ঠিকানা জানে না, তা ছাড়া সে আত্মীয়স্বজনদের এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করে। সে যে-ভাবে কলকাতায় এসে টাকা উপার্জন করছে, সেটা বিন্দুমাত্র গৌরবের নয়। দেশের বাড়িতে তাদের ঠাকুরবাড়ির ছেলে বলে যথেষ্ট সুনাম ছিল। পরিবারে যথেষ্ট আভিজাত্যও ছিল। এখন গাছে ভেসে যাবার মতো অবস্থা। যেখানে গিয়ে ঠেকে।

কিন্তু কে ডাকছে!

কোনও আড়াল থেকে যে ডাকছে, তার বুঝতে অসুবিধা হল না। সেই উর্বশী যে তাকে পছন্দ করে না, কারণ এক বার সতর্ক করে দিয়েছে, পাঁচিল টপকে যাও কেন। হুকাদাদু দেখলে তোমাকে পাকড়াও করে আটকে রাখবে। বাপুজি এ বাড়িতে অনশন করেছিলেন কি না আমি কি করে জানব! বাড়িটার সম্পর্কে এত তোমার কৌতূহল কেন?

না, আমার মনে হয়।

তোমার মনে হয় মানে!

এমন বাড়িই বাপুজির পছন্দের বাড়ি।

আসলে বাড়িটার অনেকগুলো ঘর। এবং জানালায় উঁকি দিয়েই বুঝেছিল, বাইরে বাড়ির দেওয়ালে স্যাঁতলা পড়ে গেলেও ভিতরে সব কিছু ঝকঝক করছে। দেওয়ালের সেই সাদা রঙের তিনটে ঘোড়া দেখে সে ভারী বিস্ময় বোধ করেছিল। মেয়েটির রুচি বোধেরও প্রশংসা করতে হয়। বিশাল দেওয়াল জোড়া ক্যানভাসের তিন ঘোড়া এতই জ্যান্ত যে মনে হয়েছিল, স্পর্শ করলেই ঘোড়া তিনটে ছুটতে শুরু করবে। কোনও বড় শিল্পীর আঁকা এমনও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি সে সরে গেছিল জানালার কাছ থেকে—কেউ না আবার দেখে ফেলে, মেয়েটি এমন বিস্ফারিত চোখে তাকায় যে মনে হয় এক্ষুনি গিলে ফেলবে।

মেয়েটার চোখ যথেষ্ট তাকে আকর্ষণ করে। এবং ভিতরে কিছুটা দুর্বলতাও তৈরি হয়। তবে বেশি কাছে ঘেঁষার তার সাহস নেই— এমনিতেই সে চাপা স্বভাবের এবং ভীরু স্বভাবের, সবাই যেন তাকে তাড়া করছে। কোনও কারণেই কেউ তাকে মন্দ ভাবুক, সে মন্দ স্বভাবের ছেলে এমন অপবাদের শরিক হতে চায় না। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই বাড়িটা পার হয়ে যায় এবং কাপ্পি মেরে দেখার স্বভাব, যদি জানালার পর্দা সরে যায়, তবে বিশাল আয়নায় কোনও না কোনও ভাবে তার অবয়ব ধরা পড়ে।

ইদানীং সে লক্ষ করছে, অতি প্রত্যুষেও তরুণী কিংবা যুবতী যাই বলা যাক, ঘরে সাদা আলো জ্বালিয়ে রাখে। আলো জ্বালা থাকলে বাইরে থেকে আয়নায় প্রতিবিম্ব সহজেই ভাস্বর হয়ে ওঠে। যেন নারী তার ঐশ্বর্য নিয়ে শুয়ে আছে, কেউ তার এই ঐশ্বর্য অবলোকন করুক। যে কারণেই হোক পর্দার একটা দিক সে ইচ্ছা করেই সরিয়ে রাখে বোধ হয়।

এক প্রত্যুষে সে যা দেখেছে।

অথচ সে তো কাউকে বলতে পারে না, নারী উদু হয়ে আয়নায় উলঙ্গ ছবি তৈরি করে ফেললে—কতটা বীভৎস দেখায়, সে বিশ্বাসই করতে পারেনি, কারণ সে যাবার সময় খানিকটা দূর থেকেও স্পষ্ট দেখেছে, রুমালির সব ঐশ্বর্য, স্তন গ্রীবা এবং তল পেটের সবুজ অন্ধকার। সে নারীর এই কদর্য রূপে কয়েক দিন আত্মগ্লানিতেও ভুগেছিল। সে কিছুতেই আর প্রত্যুষে জানালার পাশ দিয়ে যায়নি। খানিকটা আমলকি গাছের পাশ দিয়ে গেছে।

এই শোনো।

সে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছিল।

তার শরীর শির শির করছে।

নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্য দ্রুত হেঁটে জায়গাটা পার হয়ে যেতে চাইল।

মামি অবশ্য তাকে বলেছে, তুই ঘুরেই যাস। বাড়িটা ভাল না। বাড়িটায় কী হচ্ছে কেউ জানে না। রাতে বাড়ির ছাদে পরি হেঁটে বেড়ায়।

ছাদে পরি। ধুস!

মামির এক কথা— রুমালির মাথা খারাপ আছে। ভূতপ্রেতের উপদ্রব আছে। সব ক'টাই ভূত কি না কে জানে! ছাদের কার্নিশে দুপুর রাতে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে।

মাথা খারাপ কেন হবে। ভূত কেন হবে! তার সঙ্গে সজল কথা বলেছে। কী হাসিখুশি, অথচ এখন কেমন ভেতরে তার শঙ্কা, এ রাস্তায় সজলের না আসাই ভাল। ভাল করে লক্ষ করলে রুমালির চোখে মুখে এমন আতঙ্কের আভাস সজল দেখতে পেয়েছে।

এই শোনো, সে কোথা থেকে বলছে! সজল এ দিক ও দিক তাকাল।

জানালায় কেউ নেই।

জানালার পর্দা সরানো নেই।

বাড়ির ভেতর থেকে কেউ কথা বললে, এতটা স্পষ্ট ভাবে শোনার কথাও নয়।

সে ভাবছিল, দৌড়ে পাঁচিল টপকে বড় রাস্তায় উঠে যাবে। এই প্রত্যুষে রাস্তা বলতে গেলে কিছুটা জনবিরল। প্রথম বাস এইমাত্র চলে গেল। এক ঝাঁক ধূর্ত কাক, বাড়িটার জারুল গাছের মাথায় এসে বসেছে। এবং সহসা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে ডালপালা। রাস্তার আলো এখনও জ্বলছে।

আর এ সময়ই মনে হল আমলকি গাছের আড়ালে কেউ নড়ছে। বাতাসে বসনভূষণ উড়ছে।

সে ভীত হয়ে দৌড়ে পালাবে ভাবল।

বাড়ির ভিতর কারওর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হুকাদাদুকে অন্তত বারান্দায় দেখতে পাবে ভেবেছিল। জারুলের সরু ডাল দিয়ে দাঁত মাজার অভ্যাস। কখনও মাঠে নেমে হাঁটাহাঁটি করেন। দুখপ্রসাদ সম্ভবত একটু বেশি সকাল সকাল নিজের ঘরে ঢুকে খৈনি ডলছে। প্রাতঃক্রিয়ার সুসময় পার হয়ে না যায়, মুখে খৈনি ফিকে দিয়ে হয়তো লোটা হাতে বাড়ির ও পাশটায় পাঁচিলের আড়ালে জঙ্গলের মধ্যে বসে গেছে।

তার এই স্বভাব। কত কথা যে মগজে মুহূর্তে ক্রিয়া করে। ফের সে দৌড়বার আগে তাকাল। আর দেখল কাচের চুড়ি পরা সোনালি হাত তাকে ইশারায় ডাকছে। এক বার চুপি দিয়েও যেন গাছের আড়ালে থেকে তাকে দেখল।

ভয় পাবার তো কথা না। জানালার পাশ দিয়ে গেলেই সে দেখেছে

ঘরের সব সুঘ্রাণ তার শরীরে জড়িয়ে যায়। মামি পর্যন্ত এক সকালে টের পেয়ে বলেছিল, কী রে সজল, তোর শরীরে এত সুঘ্রাণ কেন। সকালবেলায় কেউ আতর দেয়, এমন তো শুনিনি বাপু।

সে আর কী করে এই গন্ধের ব্যাখ্যা দেয়। ব্যাখ্যা দিলেই যে কমলির কথা বলতে হয়, তার ঘরের কথা বলতে হয়। বললেই ঘাবড়ে গিয়ে বলবে। পইপই করে বলেছি, ও দিকটায় যাস না। ভাল না বাড়িটা। মানুষজন কে কেমন তাও জানা নেই। সাহেবসুবোও দেখা যায়। মেয়েটা তার সঙ্গে মাঝেমাঝে কোথায় চলে যায়! মেয়েটা তার ঘরে না কি একাই নাচে। উর্বশীর নাচ বলতে পারিস। শরীর থেকে উঠে আসা অমৃতে সে ডুবে যায়। ঘাঘরা পরে নাচে। গায়ে চকমকি কাচের ব্লাউজ থাকে। যত নাচে তত রূপ ঝলকায়।

সে দ্রুত হাঁটিয়ে। তার পর দৌড়ে পালাল।

ফেরার সময় সরকার বাড়ির মাঠ পার হয়ে জারুল গাছটার নীচে এসে হাঁপাতে থাকল।

কান থেকে কিছুটা দুধ পড়ে গেছে।

সামনের রাস্তা কাঁচা, এবং সরু। ইট সুরকি ফেলা। দু' পাশে জলা আর কচুরিপানা। হাঁটু পর্যন্ত কচুরিপানা লম্বা হয়ে আছে। খুবই সতর্ক ভাবে হাঁটতে হয়। ইট সুরকি ফেলা আছে ঠিক, তবে জলে মাটি ভিজে নিচুটা সব সময় কেমন নরম, যেন একজন মানুষের ভার নেবারও ক্ষমতা নেই, রাস্তার মাটি ভেঙে সে অতি সহজেই জলাভূমির মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

কিছুটা হেঁটে গেলেই খাঁপের মতো বস্তিবাড়ি। উঠোনের দু' পাশে দোচালা টিনের ঘর। খলপার বেড়া। অনন্তদার বউ থাকে পেছনের ঘরটায়। শুচিবায়ু, দিনের বেশিটা সময় এই পানা পুকুরের জলে ডুবে থাকার স্বভাব।

এই সজল!

সে চারিদিকে তাকাল।

গলার স্বর চেনা বলে সে বোঝে নীপাবউদি তাকে ডাকছে। কচুরিপানার ভেতর কোমর জলে দাঁড়িয়ে ডুব দিচ্ছিল, এত সকালে কেউ জেগে নেই বলে, কারওর অপেক্ষায় আছে। সজল খুব ভোরে ভোরে যখন দুধ আনতে যায়, ঠিক ফিরে আসবে, এবং তার জন্য অপেক্ষাও করতে পারে।

তুই কী রে। এত দেরি হল ফিরতে।

বউদি গলা ডুবিয়ে শরীর আড়াল করে রেখেছে। কারণ গামছা এবং জলের ঘটি ঘাটের পাড়াতে রাখা। এতক্ষণে হয়ত বিশ বাইশবার ডুব দিয়েছে জলে, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি, শরীর সবটাই ডুবেছে, না কিছু ভেসে আছে, অশুচি থাকার এই যে নিরন্তর আতঙ্ক এবং সে জন্যই যদি কেউ বস্তি থেকে বের হয়ে আসে, কিংবা বস্তিতে ঢুকে যায়— সজল বলল, হাঁ, কিছু ভেসে নেই।

আঁচল, শাড়ি সায়া?

বললাম তো কিছুই ভেসে নেই। তুমি উঠে এস। সকাল থেকে কী যে হয় তোমার, বুঝি না।

ঘুম থেকে উঠেই নীপার স্বভাব, পেছনের দিকে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়া। অনন্তদা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। মাত্র দশ টাকার ভাড়া মেটাতে পারে। এজমালি শৌচাগারে যারা যায়, তাদের সবারই পনেরো টাকা ভাড়া দিতে হয়। এক চিলতে ঘর আর ছোট্ট বারান্দা অনন্তদার। শৌচাগারের কাজটি সারে বাড়ি থেকে বের হয়ে দোকানে যাবার পথে। শিয়ালদহের স্টেশন সংলগ্ন শৌচাগারগুলি আছে বলে রক্ষা। পকেটে পাতলা গামছা থাকে। স্নান এবং শৌচকর্মটি সেরে তিনি ফিটফাট হয়ে ছায়া স্টোর্সের গদিতে গিয়ে বসেন।

সামনের এক চিলতে বারান্দাসহ ঘর নিয়ে গোপাল চক্রবর্তী অর্থাৎ তার খোঁড়া মামা-মামি থাকেন, ভিতরে ঢোকার ডান পাশের ঘরটায়। তৈজসপত্র বলতে একটি পাতি চৌকি, তার ওপর তোশক পাতা এবং সস্তা দামের চাদর বিছানো থাকে। দু'টো দু'টো চারটে বালিশ, মাথার কাছে তারে জালি দেওয়া একটি নাতিপ্রশস্ত জানালা। জানালায় চোখ রাখলে গোটা জলাভূমি চোখে ভেসে ওঠে। এক চিলতে বারান্দায় এক দিকে এক জনের শোওয়ার মতো চৌকি, সেখানে সে শোয় এবং লেখাপড়ার যাবতীয় বইখাতা ছোট্ট র‍্যাকে তোলা থাকে।

এ পাশ ও পাশ হলেও ভয়।

মেঝেতে পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, তবে খলপার বেড়াটি আছে বলে রক্ষা। পড়ে গেলেও বেড়া এবং চৌকির ফাঁকফুকুতে আটকে থাকার কথা। তার জামা প্যান্ট রাখার জন্য বেড়ায় লম্বা দড়ি টাঙিয়ে নিয়েছে। সে নিজেও সকালে তিন-চার বালতি জল আনার সময় রাস্তার কল থেকেই স্নান সেরে আসে। পাশের ঘরটিও মামার। রাতে ঘরটায় তিনি শোন। প্রয়োজনে মধ্যরাতে তিনি মামির ঘরে ঢুকে যান। এবং চৌকির বীভৎস মচমচানিতে তার ঘুম ভেঙে যায়। চৌকিতে ঝড় উঠলে সে ঘাপটি মেরে ঘুমের ভান করে। অথবা কখনও নাকেও ঘরঘর শব্দ করতে থাকে। তবে সেই ঘরে জলচৌকির ওপর রিনাথের একটা ফোটো। দেয়ালে মা কালীর ছবি, এই ঘরটি মামার সম্পূর্ণ নিজস্ব। প্রতি শনিবার, রেসের মাঠে না গেলে, রিনাথের মেলা—

ঘরটা মামি লেপে মুছে রাখে। আর ক্যালেন্ডারে যত সুন্দরী রমণী থাকে, সুচারু ভাবে সেই রমণীরা বেড়ায় ঝোলে।

কোনওটা খোঁপা নিয়ে আটকানো।

কোনওটা বাঁধানো।

দেয়াল জুড়ে এখন সব সুন্দরী নর্তকীরা বাতাসে পতপত করে ওড়ে। মামার নিজস্ব রুচি আছে, এক জন অভিনেত্রীর তিনি খুবই ভক্ত। তার একটা ঢাউস ছবি ঠিক রিনাথের ফোটোর মাথায় সব সময়ের জন্য ঝুলিয়ে রাখেন।

ছুটির দিনটি তার শনিবার।

শনিবার না হয় মঙ্গলবার রিনাথের মেলা বসে ঘরে।

শনির পূজাও দেন। প্রসাদ হয়, ঘরে ঘরে প্রসাদ বিলিও হয়। অর্থাৎ তার মামাটি সব সময় উত্তেজনা ছাড়া থাকতে পারেন না। মামি নিঃসন্তান, মামির বয়স বেশি না। মামি তার সমবয়সি এমনও বলে থাকেন মাঝে মাঝে। বালিকা বয়সে বিবাহ, গোলাকান্দাইলের চৌধুরী বাড়ির মেয়ে মনোহরদির সুরেশ চক্রবর্তীর সুসন্তান কিংবা কুলাঙ্গারও বলা চলে, তাঁর সঙ্গে এমন রূপসি মেয়ের কখনও বিবাহ হয়। বাপ সন্ন্যাসী হয়ে না গেলে— তার রাজরানি হবার কথা। তবে এটা সত্যি পারুল সর্বার্থেই সুন্দরী। যেমন লম্বা তেমনি ক্ষীণ কটি তার। তবে নিতম্ব তার বেশ ভারী।

তার পরের ঘরটায় থাকে বিনয় মামা।

এখানে উঠে আসার পর এই অপরিচিত মনুষ্যজনেরা কেউ বউদি না হয় মামা-মামি। তার নিজস্ব পিতৃদত্ত নামটিও প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।

সবাই ভাগ্না বলেই ডাক-খোঁজ করে।

গোপাল চক্রবর্তী যে সে লোক নয়, তার ভাগ্না কলেজে পড়ে, আগে বলেই সান্ত্বনা পেতেন, এখন ভাগ্নাটিকে সশরীরে হাজির করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি কত বড় বংশের সন্তান।

বিনয় তাঁর প্রকৃত সুহৃদ, কারণ বিনয়মামাই তাঁকে এই বাড়িটার খবর দিয়েছিলেন— আগে থাকতেন, বরানগরের বাজার পার হয়ে ভিতরের দিকের বস্তিতে। সেখানে ভাড়া বেশি। নেশা গাজা-ভাং মদ, এই সবের পরও রেসের মাঠে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া। প্রায় দিনই এ জন্য মামির সঙ্গে মারামারি শুরু হত। মামা নেশার ঘোরে বেধড়ক পেটাতেন এবং প্রতিবেশীরা বাধ্য হয়ে তাকে পাড়া ছাড়া করতে উঠে পড়ে লেগে গেল, বিনয়মামা এই সুসংবাদটি দিয়েছিলেন।

গোপাল, তুমি চলে এস। বাড়িয়ালার উৎপাত নেই। সময় মতো ভাড়া দিলে, সে তোমাকে কখনও তাড়া করবে না।

বিনয় মামা এই বস্তির শুরু থেকেই আছেন।

যেহেতু একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া কখনও রাতে সঙ্গমপ্রিয়তা তৈরি হত না, অর্থাৎ সুযোগের অভাব, এবং দিনের বেলাতেও সে অনেক সময় দেখেছে, দরজা বন্ধ এবং সঙ্গমে রত মামা-মামির হিকার শব্দ, অর্থাৎ মামা-মামির দিনরাত বলে কিছু নেই, সুযোগ পেলেই লেগে পড়া। বারান্দায় সে থাকে, পড়াশোনা করে, কয়লার উনুনে ডাল ভাত, কখনও মাছ হয়, কখনও হয় না। তবু মামা তাকে তুলে না আনলে শেষ পর্যন্ত তার কলেজে পড়া হত না। বেতড়ে দু' মাস পাচকের উপার্জনের টাকায় মোটামুটি ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করতে পারায় সে মামার উপর খুব কৃতজ্ঞ। থাকা খাওয়া, খাওয়া অবশ্য কী হয় সেই জানে। রাতে শুধু রুটি আর একগ্লাস চা— মামা-মামি এবং সে বেশি দিন এই খেয়েই থাকে। রোজগারের পয়সা উড়িয়ে দিলে যা হয়, আর ফুটানি কাকে বলে— প্যান্ট-শার্ট, মামি নিজেই ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখেন, জুতো পালিশ করে রাখেন, আর সিগারেট তো আছেই, এখানে এসে সে বুঝতে পেরেছে খাওয়াটা হলেও চলে, না হলেও চলে। কিন্তু ফুটানি বজায় থাকা চাই, খাও না খাও কেউ দেখতে যাবে না, পোশাকেআসাকে মালিন্য থাকলেই ধরা পড়ে যাবে।

বিনয়মামাই তার প্রিয় মানুষ। মানুষটা সকাল হলেই এক ব্যাগ ধূপবাতির প্যাকেট নিয়ে বের হয়ে যান, ফেরেন রাত করে। ধূপবাতি বিক্রি করে তাঁর ভালই চলে যায়— প্রকৃত সংসারী মানুষ। শত চেষ্টাতেও গোপাল তাঁকে টলাতে পারেনি। তার এক প্যাকেট বিড়ি হলে সারা দিন চলে যায়। সুরভিমামি পরিপাটি করে রান্না শেষে অপেক্ষা করেন, মানুষটা কখন ফিরবে। তাঁকে খেতে না দিয়ে নিজে কখনও আগে খেয়ে নেন না।

ভালমন্দ রান্না হলে সুরভি মামি তাকে আড়ালে ডেকে বলেন, ভাগ্না নাও। তোমার মামার জন্য একটু পায়েস করেছিলাম, দ্যাখো তো, মিষ্টি ঠিক হয়েছে কি না। আমি আবার পায়েসের মিষ্টির আন্দাজ পাই না।

...টী চেটেপুটে শেষ করলে দরজায় উঁকি দিয়ে কী দেখতেন— আসলে ...মামা-মামি দরজা খোলা রেখেছে, না, বন্ধ আছে দেখেই ছুটে আসতেন। ...বলে আরও দু' হাতা পায়েস দেবার সময় বলতেন, কিসমিস দিতে ভুলে ...গিয়েছিলাম— কিসমিস দিয়ে নেড়ে দিয়েছি। তুমি খাও।

...সুস্বাদু খাওয়ার বিষয়ে সজলের যথেষ্ট লোভ। কিছুতেই না করতে পারে না।

...মামি পারুলের চেয়ে সুরভিমামির যে যথেষ্ট বয়স বেশি, এবং বাঁজা মেয়েছেলে, তার থেকেই হয়তো পারুল তাকে সুরভি সম্পর্কে সতর্ক রাখত। ...ডাকলেই যাবি নে সজল।

যাই না তো।

...যে তুই। এত কী আদিখ্যাতা, ডেকে তোকে ভাল মন্দ খাওয়ায়। ...কীসের এত আকর্ষণ, তুই তার কে, তোর লজ্জা করে না, তোর মামার ...রোজগার কত এরা জানে!

সজল বুঝতেই পারত না, রোজগারের কথা আসে কী করে। সুরভি ...তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, পুত্রবতী নন তিনি। তাঁর মেয়েটি বস্তির ওলাওঠায় মারা গেছে— সুরভি যে বাঁজা নয়, সে খবরও সজল রাখে।

ছুটির দিনে বিনয়মামা, তাকে সঙ্গে নেবেই।

গোপাল রাজি হতেন না।

আরে ও যাবে কী করতে। ও কলেজে পড়ে, সে ধূপকাঠি বিক্রি করে বেড়াবে। ওর পড়া আছে না!

বিনয়মামার এক কথা— আমার সঙ্গে থাকবে। কলকাতা কত বড় শহর চিনতে হবে না গোপাল। সারাদিনই কি কেউ পড়ে! আর লেখাপড়া করলেই হবে, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে না। মানুষের সঙ্গে যত মিশবে, তত তার পরমায়ু বাড়বে।

গোপাল বলত, দ্যাখো, যায় কি না।

সজল নিজেই যে এক দিন বলেছিল, আমাকে সঙ্গে নেবে মামা। তোমার সঙ্গে ধূপবাতি বিক্রি করব। সারাদিন একা একা ভাল লাগে না।

না, না, তোর মামা রাগ করবে। তোর পড়ার ক্ষতি হবে।

বিনয় এও বোঝে কলেজ না থাকলে সজল খুবই মনমরা হয়ে যায়। বস্তির নারী পুরুষের মধ্যে অকারণে বচসা, গালাগাল এবং ইতর কথাবার্তাও যে হয়। কথার লাগাম থাকে না। একজন তরুণের পক্ষে এই সব অশ্লীল উচ্চারণ খুবই মর্মান্তিক। লাজুক স্বভাবের সজল তখন ঘর থেকে বের হয়ে যায়। জারুল গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বস্তির এই আদিম বচসা থেকে তার আত্মরক্ষার্থেই সজলকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার।

সজল তখন রাস্তা ধরে হেঁটে যায়।

কিংবা সরকার বাড়ির মাঠ পার হয়ে বড় রাস্তায় একা একা হাঁটে।

কেমন খারাপ লাগে বিনয়ের। সজলকে এই বস্তিতে তুলে এনে গোপাল ঠিক করেনি। মার্জিত রুচি, সরল এবং অকপট সজল যেন প্যাঁচে পড়ে গেছে। সেই জন্যই বলা, গোপাল, ভাগ্না আমার সঙ্গে যাবে। আজ তো কলেজ নেই। গেলে ওর ভালই লাগবে।

সজল নিজেও বলবে, চলো আমি যাচ্ছি।

তার পর দু'জনেই বের হয়ে যায়। এবং বাস ধরে রেল সেতুর মুখে নেমে পড়ে।

তার পর কথা হয়—

সজল এ দিকে আয়।

একটা সরু রাস্তা পার হয়ে যায় তারা। সামনে বাজার। বাজার থেকে বিনয় ব্যাগ কেনে। ধূপকাঠির পাইকার চিনিয়ে দেয়।

এটা ধর।

তার পর কিছু ধূপের প্যাকেট ঢুকিয়ে দেয় ব্যাগে।

চন্দন ধূপ, ইমামি ধূপ, সুরভি, সূর্যমুখী সব রকমের ধূপকাঠির প্যাকেট আছে ভাগ্না। পারবি তো!

দু'-চার দিন তোমার সঙ্গে আগে ঘুরি।

চল না। ঠিক পারবি।

তার পর কেন বিনয় বলল, একসঙ্গে ঘুরলে হবে না। ছুটির দিনটা কাজে লাগা। কী লজ্জা করছে! তুই এক পাড়ায়, আমি আর এক পাড়ায়।

লজ্জা করবে কেন!

চাই ধূপবাতি, ইমামি, সুরভি সূর্যমুখী, চাই... এ সব উচ্চারণ করা এবং রাস্তায় রাস্তায় হেঁকে যাওয়া খুবই কঠিন কাজ, গলা থেকে তার স্বরই বের হচ্ছে না।

এই দ্যাখ, বলেই বিনয় হেঁকে উঠল, ধূপ নেবেন, ধূপ— সূর্যমুখী, চন্দনপুরী ঘ্রাণে পবিত্রতা, নেবেন মা-মাসিরা, সুগন্ধি ধূপ, সুগন্ধে মন জুড়িয়ে যায়।

কী এক আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠে যেন ডুবে যায় পাড়াটা— বাড়ি ঘরের জানালা খুলে যায়, কোনও বাড়ি তাঁর বোধহয় চেনা, অথবা জানালায় উঁকি দিয়ে লঘু স্বরে প্রশ্ন, ঠাকুমাকে দেখছি না। আসলে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের সঙ্গে সহৃদয় হওয়া— কিংবা একাত্ম হওয়া। কিন্তু এই সুরেলা কণ্ঠ রপ্ত করাই যে কঠিন।

সজল এখনও বিনয়ের পিছু পিছু হাঁটছে। সে একা আলাদা ভাবে অন্য কোনও পাড়ায় ঢুকে যেতে সাহস পাচ্ছে না।

কী হল! বিনয় প্রশ্ন না করে পারল না।

আজ তোমার সঙ্গে ঘুরি। রাস্তাঘাট চিনি না। এক দিনে মনে হয় হবে না।

সজলের মুখ দেখে কেমন মায়া হয়। যেন এই যে হাঁক, চাই বেলফুলের মালার মতো, অথবা এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে ঢুকে যাওয়া, কখনওই সে পারবে না, তা ছাড়া এ দিকটায় খাল পার ধরে হেঁটে গেলে, মানুষের অজস্র ঘরবাড়ি, মানুষের ভিড়ও লক্ষ করা যায়, সে কী করে চেঁচায় তাই তো জানে না। তার যে একটা স্বপ্ন জুড়ে শরীর। তার কণ্ঠ যে শুকিয়ে যায়।

ঠিক আছে আজ আমার সঙ্গেই থাক। ঘুরতে ঘুরতে হয়ে যাবে। জানিস কুড়ি পয়সার একটা প্যাকেট বেচতে পারলে নেট দশ পয়সা লাভ। সারাদিন ঘুরলে পাঁচ-সাত টাকাও লাভ হতে পারে।

সরু গলির জানালায় কাকে যেন খুঁজছে বিনয়। বড়দি আছেন না কি!

কে?

আমি বিনয়।

মহিলার চোখে মুখে অদ্ভুত বিস্ময়ের হাসি। কী ব্যাপার। কত দিন তোমার পাত্তা নেই। ভিতরে এস।

সজলের কত যে কুণ্ঠা। চেনা জানা নয়, আবার মনে হল চেনাজানাও হতে পারে বিনয়মামার। কিন্তু সে তো তাদের চেনে না? সে রাস্তাতেই অপেক্ষা করবে এমন এক চিন্তায় আবদ্ধ হয়ে গেলে, বিনয় মামা পেছন ফিরে বলল, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। আয়, এ দিককার দাদা-বউদিরা আমার কাছ থেকে ধূপবাতি কেনে। আমি না এলে ফাঁপরে পড়ে যান তাঁরা। আমাকে খুব ভালবাসে। তারা জানে বিনয় কাউকে ঠকায় না। আমি তো আগরবাতি ধূপ তাদের দিই। যার যা পছন্দ। পছন্দের জিনিস না পেলে লোকে কিনবে কেন।

বাড়িটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সদর দরজায় মাধবীলতার গুচ্ছ ঝুলছে। দরজা খুলে বড়দি বললেন, এস বিনয়। সঙ্গে এটা কে।

আমার ভাগ্না হয় বড়দি। কলেজে পড়ে। সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছি।

এই রোদে! তোমার কি মাথা খারাপ বিনয়। তোমার অভ্যাস আছে। রোদে ঘুরলে অসুখে পড়ে যাবে। একে নিয়ে বের হলে কোন সাহসে! কলেজে পড়ে তো, তোমার সঙ্গে কেন ঘুরছে!

বিনয় যে কী বলে!

আসলে সজল তো নিজেই এসেছে? তার যে চার পাশে বিশ্রী পরিবেশ। সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই চলে এসেছে। তার আর যাবারও তো জায়গা নেই। বলতে গিয়েও থেমে গেল বিনয়। —বড়দি একটা কথা বলব!

আগে বোসো তো। খোকা তুমি রোদে দাঁড়িয়ে থেকো না। বারান্দায় উঠে এস।

সজল চার পাশে তাকিয়ে দেখছে। ছোট্ট উঠোনে একটা শিউলি গাছ আছে। শিউলি গাছ দেখলে তার মন খারাপ হয়ে যায়। বাড়ির কথা মনে হয়। মা, বাবা, ভাই, বোনের কথা মনে হয়। তাদের উঠোনেও একটা শিউলি গাছ আছে। মাটির ছোট্ট বেদিতে মা একটা তুলসী গাছও লাগিয়েছেন।

বিনয়ের আবার প্রশ্ন, কাকিমাকে দেখছি না, মেসোমশাই কি পুজার ঘরে?

আসন পেতে দিয়ে বড়দি বললেন, তুমি যে আমাকে কী একটা ধূপকাঠি এনে দেবে বলেছিলে, এক বার জ্বালালে সারা রাত গন্ধ থাকে, কী যেন নাম বলেছিলে,

বিনয় বলল, রজনীগন্ধা।

আমার ও রকম ফুলের গন্ধই ভাল লাগে। হালকা অথচ মিষ্টি গন্ধ। এনেছ!

আজ্ঞে না। সোনারপুরে পাওয়া যায়। অবিনাশ মাঝির হাতের তৈরি ধূপ। যেতে হবে।।

—একটা কথা বলবে, কিন্তু তো বললে না।

বিনয় ব্যাগ থেকে নতুন কিছু প্যাকেট বের করে দেখাল। ধূপ জ্বালিয়ে হাওয়ায় গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ভাল না গন্ধটা।

দু' প্যাকেট রেখে যাও। চা হচ্ছে খেয়ে যাবে— কিন্তু তোমার যে কথা ছিল বললে।

এই সজল প্রণাম কর। আদর্শ বালিকা বিদ্যামন্দিরের বড় দিদিমণি। ঠেকা-বেঠেকায় দিদির কাছে হাতও পাতি।

সজল প্রণাম করতে গেলে বলল, না, না, আরে কী করছ!
সজল তবু পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।
চা হচ্ছে, বোসো। বলে তিনি ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন।
সজল বড় কুণ্ঠিত গলায় বিনয়কে আড়ালে বলল, তুমি বসে পড়লে! সবে দু' প্যাকেট, এতটা হেঁটে দু' প্যাকেট সারাদিনে তোমার কী বিক্রি হয় বুঝি না।
আরে বোস না।
বড়দি ফিরে এসে বললেন, বল, কী কথা বলবে বলেছিলে।
না বলছিলাম, যদি আপনি সজলকে দু'-একটা টিউশনির ব্যবস্থা করে দেন। বড় উপকার হবে ছেলেটার।
সজল যে এই বাড়িতে কোনও ভদ্র সন্তান নয়, কারণ লাল সিমেন্টের লম্বা বারান্দা, মেলা চেয়ার পাতা, কাঠের এবং টিনের একটা ইজিচেয়ারও আছে, কিন্তু তাদের বসার জন্য আসন পেতে দেওয়া হয়েছে। এক জন ফেরিয়ালার পক্ষে কখনও চেয়ারে বসা সম্ভব নয়, আসন পেতে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অথচ বড়দি যথেষ্ট অমায়িক, এবং সহৃদয়। কিংবা সজলের মনে হল চেয়ারে বসতে বললে তার অস্বস্তিই হত। সে তো তাদের কেউ হয় না। বিনয় মামার সঙ্গে ঘুরছে, একজন শিক্ষার্থী হিসাবে। যদি এই করে তার কিছু উপার্জন হয়, আসলে কিছুটা স্বাবলম্বী হওয়া।
সজলের অপমান বোধ কিঞ্চিৎ হলেও আছে।
সে চাইছিল না, বিনয়মামা আর দেরি করুক।
কিন্তু তিনি তো আজ এ বাড়িতে অন্য আবদার নিয়ে এসেছেন। তাও আবার তাঁর প্রয়োজনে নয়, সজলের প্রয়োজনে।
সে জানে, বস্তি বাড়ির মানুষজনেরা নানা রকমের সংকীর্ণতার শিকার। তার মামা কাউকে বলে কিছু করেও দিতে পারবেন না। প্রুফ লাখে ঠিক, তবে প্রকাশকদের অধিকাংশই ছাঁচড়া স্বভাবের। টাকাপয়সা সহজে দিতে চায় না। যদি টিউশনি হয়, হলে খুবই ভাল। বিনয়মামা কি তবে তাকে নিয়ে যে ঘুরছেন, তাঁর কোনও হিল্লে করে দেবার জন্য। সে তো বিনয়মামাকে কিছু বলেনি, সে তো মনে করে না সে খুব খারাপ আছে। নোংরা ইতর কথা, অবশ্য প্রকাশ্যেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে বস্তিতে অবলীলায় উচ্চারিত হয়, জীবনের অজস্র রকমের অশ্লীলতারও আভাস পায়, তার শরীর গরম হয়ে যায় লজ্জায়। নীপাবউদি এক দিন তো ঠেস দিয়ে সুরভিমাসির সঙ্গে পর্যন্ত তাকে জড়িয়ে দিল— অবশ্য সে প্রতিবাদ করে না— তার সব সয়ে গেছে, অন্ধকারে সে তার তক্তপোষে শুধু মাথা নিচু করে বসে থাকে।
এ বার বোধহয় বড়দি সজলকে ভাল করে দেখলেন।
সজল কারওর দিকে তাকাচ্ছে না। বিনয়মামা টিউশনের কথা বলে তাকে খুবই ফাঁপরে ফেলে দিয়েছেন— এমনিতেই সঙ্কুচিত সে, বিনয়মামার গোত্রের মানুষ সে, তার কলেজে পড়াও অনুচিত, আবার সেই খবর একজন অপরিচিত ভদ্রমহিলার কাছে বলা কতটা দায়িত্বশীল কাজ, সে তা বোধহয় ভেবেই পাচ্ছে না।
বড়দি খুবই যত্নের সঙ্গে ট্রেতে করে দু' কাপ চা, দু' পিস করে স্যাঁকা পাউরুটি, কারণ তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন খালি পেটে চা খেলে শরীরের অপকার হয়, এবং গরিব মানুষেরা কখনওই যে এ দেশে পেট ভরে খেতে পায় না, সে বিশ্বাসও থাকতে পারে তাঁর। সে যাই হোক, বড়দি তার নাম ধরেই বললেন, সজল তুমি কোন কলেজে পড়ো।
আর সজলের কেন জানি মনে হল, বিনয়মামার খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে, শেষে তিনি তাঁকে এ ভাবে জড়াবেন সে কল্পনাই করতে পারেনি, কখনও বিনয়মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ জলে ভার হয়ে আসছে, আবার কখনও কেন যে রাগে ফুঁসছে, সে মাথা নিচু করেই বলল, রিপন কলেজে পড়ি।
কোন ইয়ার।
সেকেন্ড ইয়ার।
কী নিয়ে পড়ছ?
সাইন্স নিয়ে।
কম্বিনেশন কী?
কেমেস্ট্রি, ম্যাথ।
স্কুল ফাইনাল কোন ডিভিশনে।
সজল উত্তর দিতে লজ্জা পাচ্ছে। এই শহরে এই প্রথম কেউ একজন তার পড়াশোনার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝতে পেরে সমীহ করতে শুরু করেছে।
তিনি ফের বললেন, কোন ডিভিশনে পাশ করেছ। বল না। লজ্জা কী।
ফার্স্ট ডিভিশনে।
এতটা বিচলিত সজল যে, এই সব কথায় তার চোখে জল আসে কেন বোঝে না। সে তার মুখ আড়াল করতে চাইছে।
আর বড়দির মুখ দেখে বিনয় ঠিক বুঝতে পারছে, বড়দি সজলের সব খবর শুনে ভারী বিস্মিত। আর হঠাৎ কেন যে বড়দি বলে ফেললেন, তুমি তো জুয়েল ছেলে! তুমি থাকো কোথায়?
বিনয় বলল, কোথায় এক জায়গায় পাচকের কাজ করে কিছু টাকা উপার্জন করেছে। তাই দিয়ে বাকি বেতন দিয়েছে। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছে। থাকে ওর মামার কাছে, আমাদের পাড়ায়।
সহসা বড়দি বললেন, তুমি পাচকের কাজ করতে কেন?
কলেজের মাইনে বাকি, কী করি।
তোমার বাবা কী করেন?
কিছুই না। যজন যাজন, আর তো খাতা লেখা।
চলে কী করে?
বিনয়মামার জন্যই সে যে এই এক অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে। সে নিজের কথা কাউকে বলতে চায় না।
তার নিজের মামা মানুষটিরই কাজ। আমাকে তুলে এনেছে। সে কী করত, কোথায় দেশ, কলেজে পড়ে, এ সব তার মামাই চাউর করে দিয়েছে।
এতে যে তার আত্মসম্মান থাকে না!
বড়দির কথায় সে কোনও জবাব দিল না। সজল অবশ্য এমন অভদ্র আচরণ করার মতো ছেলে নয়।
বিনয় ঠিক বুঝেছে, বাবুর অপমান হয়েছে।
বড়দি কী ভেবে বললেন, আমি দেখছি। বিনয় তুমি পরে খোঁজ নিও।
রাস্তায় নেমে সজল ফেটে পড়ল।
আর আসছি না।
আরে তোর ভালর জন্যই তো বললাম। ক'টা টিউশন পেলে, তোর হাতখরচা হয়ে যাবে।
আমি পাচকের কাজ করতাম, না? আরে ওরা আমার কলোনির লোকজন। চল্লিশ গজ ব্যান্ডেজের কাপড় না দিতে পারলে, আমার যে কাজই থাকে না। টাকার খুব দরকার, পড়াশোনা বন্ধ হয়ে না যায়, তারা আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বলল, চলো ঠাকুর আমাদের সঙ্গে। কলেজ ছুটি যখন, যদি কিছু তোমার উপার্জন হয়।
বিনয় হাঁটছে। সে কিছুটা বেকুব।
ওরাই শেষ পর্যন্ত বলল, তুমি বরং আমাদের রান্নার দিকটা সামলাও। আমরা মেস করে থাকতাম। নিজেদের কাজ নিজেরা করলে কি পাচকের কাজ হয়! মুখ দেখে তো কেউ পয়সা দেয় না।
সজলকে এতটা উত্তেজিত হতে সে কখনও দেখেনি।
মাথা গরম করিস না। কোনও কাজই খারাপ না। তুই তো চুরি করছিস না। ধূপবাতি ফেরি করাও যা, পাচকের কাজ করাও তাই।
সজলের সহসা কেমন রোখারোখি হল যেন। আহাম্মকের মতো সে ঝগড়া করছে! আসলে জানালার আড়ালে তারই বয়সি একটি মেয়ে তাকে যে চুরি করে দেখছিল! লজ্জা হয় না!

কিছু দিন থেকেই রমাদি যেন মনমরা। সে আজকাল খুব সকালে ওঠে। চোখে মুখে জল দেবার আগে রাতের পোশাক খুলে ফেলে, তার পর আয়নার সামনে দাঁড়ায়। দর্পণে তার প্রতিবিম্ব ভাসে। এক জন কামুক তরুণ যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও কেন যে নিজেকে সুরসুন্দরী ভাবতে ভাল লাগে। স্তন এবং নাভিমূলে চিহ্নিত হয়ে আছে আঙুরলতির ক্ষত। সেই তরুণ যুবকের কথা ভাবলেই সে স্থির থাকতে পারে না।
সে আর আসে না।
সেই যে প্রত্যুষে 'এই শোনো' বলে ডেকেছিল, তার পর দ্রুত পলায়নপর যুবকের, কেমন এক আতঙ্ক থেকে যেন বাড়ির পাঁচিল টপকে আর সে আসে না।
সে তো কিছু চায় না।
শুধু সজলকে কাছ থেকে দেখতে চায়। গল্প করতে চায়।
তার নানা প্রশ্ন এখন চিহ্নিত হয়ে আছে মুখের রেখায়।
কেন আসে না!
কেন আমলকি গাছটার গোড়ায় সে অল্প ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করত। কী খুঁজত সে।

এক বার জানতে চেয়েছিল এই বাড়িটাই কি সেই বাড়ি, যেখানে বাপুজি বসবাস সময় অনশন করেছিলেন?

সে তো তার মামাও জানে।

সুরভিমাসি কড়ুবিশমার বস্তি থেকে বাসন মাজতে আসে। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে, সাফ রাখে। সেই বলেছে ও, সজলের কথা বলছে। ওকে বস্তিতে দেখা না। খাটাল থেকে দুধ নিয়ে যায়। ওর মামা গোপাল চক্রবর্তী নেশাভাং করে। গাঁজা খেলে দুধ খেতে হয়। সেই দুধের জন্য সে খাটালে যায়। পড়ার চাপ খুব। মাসি-মামার ফাইফরমাস খাটে। বড় ভাল ছেলে। বড়দি ওকে টিউশন ঠিক করে দিয়েছে। কলেজ ফেরত টিউশন সেরে ফেরে। ছুটি থাকলে মামার কাজের সঙ্গে বের হয়ে পড়ে।

এত সব খবর সুরভিমাসিই রুমালিকে দিয়েছে।

তার জিনমামার সঙ্গে সজল পাড়ার রাস্তায় হেঁটে গেলে বাড়ির জানালা খুলে যায়। সব সুন্দরী বালিকারা হেসে কথা বলে। গাছ তাকে ছায়া দেয়। পাখিরা উড়ে আসে। বস্তির নারী পুরুষ তাকে খুবই পছন্দ করে। ওর সঙ্গে কথা বললে মানুষের মন ভাল হয়ে যায়।

এই সব ভাবতে ভাবতে রুমালি খুবই প্রত্যুষে মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। প্রতি দিনের মতো আজও সে আমলকি গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াবে। সজল তো জানে না, এই গাছের সঙ্গে তার পরমায়ু যুক্ত হয়ে আছে। গাছটা যত দিন বাঁচবে, সেও তত দিন বেঁচে থাকবে। কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। তার দাদাজি তার জন্ম সময় এবং একটি গাছের জন্মসময়-সহ ঠিকুজি কোষ্ঠী করে রেখে গেছেন। হকাদাদুর মুখ থেকেই সব সে জানতে পেরেছে।

সকালে ঘুম ভাঙলেই তার কষ্ট। প্রিয়জন না থাকলে যা হয়। কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে না। ঝি-চাকরের হাতে মানুষ— তাকে শাসন করার কেউ নেই, তাকে বাড়িটায় একা থাকতে হয়, সে একা বড় হচ্ছে। জীবনের কোনও সত্যমিথ্যার গভীর রহস্য তাকে জড়িয়ে রেখেছে সে তাও বোঝে। হকাদাদু আভাসে ইঙ্গিতে কী যে বলতে চান। অবশ্য সে জানে জন্মের কিছু দিন বাদেই তার মায়ের মৃত্যু। এও জানে, দাদাজি তার নামে কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রেখে গেছেন এবং এ জন্য অপহরণের ভয়ও আছে। তার বিমাতা অনুরাধাকেও সে কখনও দেখেনি। ভয়ঙ্কর ক্রোধ এবং ঈর্ষা নিয়ে রমণী জ্বলছে।

তাকে তার বিমাতা ক্ষমা করবে না, কারণ মা কুমরিওয়ালির মতোই সে সুন্দরী। বাবুজি আর মা-র কথা ভাবলেই কেমন এক বন্যপ্রেমের গন্ধ পায় সে।

তার বন্ধুবান্ধব বলতেও কেউ নেই। স্কুলের বান্ধবীরাও তাকে বিশেষ পাত্তা দিত না। বাবা মানুষটি যে বিমাতা অনুরাধার চোখ থেকে তাকে বাংলা মুলুকে আড়াল করে রেখেছে, তার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হকাদাদু আর টুকিপিসি তাকে নিয়ে যে পালিয়ে এখানটায় চলে এসেছিলেন, বাড়িটা তখন খালি পড়েছিল, সে কথাও রুমালি জানে। কোথাকার এক ম্লেচ্ছ রমণী মদন গাছের মাথা চিবিয়ে সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, এবং সেই রোষানলে রমণী নিরন্তর পুড়ছে— ঘুম থেকে উঠলে এ সব মনে হয় রুমালির। তার কান্না পায়। মহিলা তার ওয়ারিশন গায়েব করতে চায়। তাকে মুছে দিতে চায়।

কখনও ভাল ছবি আঁকতে পারলে দিনটা তার ভাল যায়। শান্তিনিকেতনে কিছু দিন সে ছিল। তখনও অহরহ এই আতঙ্ক তাকে তাড়া করত। এ কারণে সে কখনওই উজ্জ্বল হতে পারত না। বেলেঘাটার এই বাড়িটায় ছুটে আসত। আমলকি গাছটায় কোনও ক্ষত সৃষ্টি যদি হয়, কারণ তার তো জন্মের সঙ্গে এই বৃক্ষ তাকে ছায়া দেবে বলে স্থির হয়েছে। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে বছর দুই ছবি আঁকার অনুশীলন করেছে। এ বিষয়ে তার সহজাত ক্ষমতাই একমাত্র তার অনুসরণকারী।

এই যেমন সে দেখছে, সজল বস্তি থেকে বের হয়ে দু' পাশের জলার ভিতর দিয়ে যে রাস্তা, অতিক্রম করছে— চোখে এই সকালেও বাইনোকুলার লাগিয়ে গাছের আড়ালে দূরবর্তী সরকার বাড়ির মাঠে সজল, লম্বা দীর্ঘকায় যুবক, হেঁটে চলে যাচ্ছে, তাদের কুঠিবাড়ির আড়ালে পড়ে গেছে সজল। আবার বড় রাস্তায় যেখানে সরকার বাড়ির মাঠ এসে মিশেছে সেখানে সজল, রাস্তা পার হচ্ছে, এবং রাস্তার নীচে নেমে খাটালের দিকে অদৃশ্য হতেই সে দৌড়ে গেল পাঁচিলের কাছে— পাঁচিল টপকে সে রাস্তায়ও চলে যেতে পারে, তবে বাড়ির পাহারাদারদের জন্যই পারছে না। এই দিকটা এখনও জনবিরল, তবে দুঃখপ্রসাদ আর হকা সিংহের ঠিক নজর আছে তার ওপর।

তবে সে রাস্তা পার হয়ে গেলেও ওরা তাকে বাধা দিতে পারবে না। অনুরোধ, উপরোধ কিংবা মিনতি, দিদিমণি বাড়ি চলো। একা বের হয়ে আসছ, দিনকাল ভাল না, তখন হয়তো ওদের বিপদ বুঝেই সে কুঠিতে ফিরে আসে। কিছু একটা হয়ে গেলে হেমকুণ্ডে তার যাবে। বাবুজি এখন হেমকুণ্ডের মঠেই থাকেন। তারই প্রতিষ্ঠিত মঠ। কোনও নারীর জন্য নিজেকে এ ভাবে কেউ পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে ভাবলেই বাবুজির জন্যও তার চোখ জলে ভার হয়ে যায়। তার জন্য বাবুজি বড় উৎকণ্ঠায় থাকেন।

অনেক সময় তার মাথা ঠিক থাকে না। কী যে হয় ভিতরে সেও বোঝে না, কেমন এক ঘোর থেকে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তখন সে পাগলের মতো চেঁচায়। কেন আমাকে তোমরা মেরে ফেলতে চাও। আমার কী দোষ। কেন আমাকে তোমরা বড় হতে দিচ্ছ না। বাবুজি মঠ প্রতিষ্ঠা করে যদি জীবনের মোক্ষ লাভ করতে চান তার জন্য আমি দায়ী হব কেন। কেন। কেন।

সবাই তখন ছুটে আসে।

টুকিপিসি ঘাবড়ে যায়। এই মহিলাই তাকে সন্তানস্নেহে বড় করে তুলেছেন। তার কান্নাকাটি শুরু হলে সে ঘাবড়ে যায়। রুমালি, আস্তে আস্তে। কী আজেবাজে বকছ। ইস কী হবে, ঘরে ঠিক আছে, এত রাগ মেয়েদের শোভা পায় না। তার পরও কেন যে তখন সে আরও জেদি হয়ে যায়, প্লেট-ডিশ ছুড়ে দেয়, বিছানার চাদর-বালিশ সব ছুড়ে দেয়, এক ভয়ঙ্কর ক্রোধ তাকে তাড়া করে, মা কেন তার আর কিছু দিন বেঁচে থাকলেন না। তার কী দোষ, বাবা কেন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান, তাঁর সেক্রেটারি সরযূপ্রসাদ সঙ্গে থাকে, অনুরাধা পাছে সব শক্ত হাতে সামলাচ্ছেন। চালকাপুরীর সেই প্রাসাদের এলাহি ব্যবস্থা। সেখানে মহলে মহলে কেরানি, অফিসার, নিরাপত্তারক্ষী। সে কেন তবে অজ্ঞাতবাসে থাকবে। পরিবার আত্মীয়স্বজন কেন তার থাকবে না। সে কবে সাবালিকা হবে; অথচ সে তার শরীর দেখে বোঝে, কবেই সে সাবালিকা হয়ে গেছে। ষড়যন্ত্র করে তাকে নাবালিকা সাজিয়ে রাখা হয়েছে— সে কেন মানবে এই সব অত্যাচার। ভাবতে ভাবতে মাথায় আগুন জ্বলে উঠলেই সে স্থির থাকতে পারে না।

সে তো শুনেছে তার মা জিপসিদের মেয়ে। সে তো শুনেছে, তার মা শেষ পর্যন্ত ধর্ষণকারীকেই ভালবেসে ফেলেছিল এবং ধর্ষণের ফলে অন্তঃসত্ত্বা— সত্য, মিথ্যা না গুজব, যেন এক মায়াবী বিভ্রম তাকে তাড়া করছে। তাকে ঘিরে ধরেছে।

রুমালির চোখে সকাল থেকে আজ সজলকুমার সচল হয়ে আছে।

সজলকুমার।

সজল নয়, তাকে সে সজলকুমারই ডাকবে।

সেই সজলকুমারকে কাছে পাবার জন্য সারা দিন তুলি আর রং নিয়ে ছবিতে একজন তরুণ যুবকের বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে হাত ধরে স্পর্শ নেবার চেষ্টা করছে।

সারা দিনের ক্লান্তি।

খাওয়া স্নান সব ভুলে ছবি আঁকায় মগ্ন হয়ে আছে।

চলচ্চিত্রের মতো সেই ছবিতে নারীর বন্যপ্রেম মুগ্ধ দৃষ্টি।

ছবিটা কিছুতেই শেষ করতে পারছে না।

কোনও রকমে স্নান খাওয়া সেরে সে ভেবেছে ছবিটা শেষ করবে।

কিন্তু কিছুতেই মুখ আঁকতে পারছে না।

কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মুখ।

সে বালিশে মুখ রেখে সামান্য সময় ফুঁপিয়ে কাঁদল।

তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

এবং এক দূরাতীত স্বপ্নে সে দেখল, আমলকির এক গভীর বন সৃষ্টি হয়ে গেছে তার সামনে। গাছের ফাঁকে দেখল, জঙ্গলে কোনও সরোবর, সরোবরে রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটে আছে। আর চালতা গাছের বনজ ছায়া, যেখানে স্থির নিষ্পলক হয়ে সেই যুবক তাকে দেখছে।

তার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

যেন সে প্রকৃতই নাবালিকা ছিল। প্রেমের জোয়ার আসায় তার স্তন ফুলে ফেঁপে গেছে এবং নাভিমূলে সৃষ্টি হচ্ছে শরীরের অনন্ত ইচ্ছে।

সব কেমন ভেসে যাচ্ছে।

সে ধড়ফড় করে উঠে বসল।

সাদা চাদর ভিজে গেছে।

তার সালোয়ার কামিজে সেঁটে আছে শরীরের গুহ্যাতীত শৃঙ্গার ধারা।

নারী একজন পুরুষের জন্যই বড় হয়ে ওঠে— এই বোধ থেকে তার শরীরে শিহরণ খেলে গেল। এও এক যেন ম্যাজিক— আত্মরতি, সে এ সব বুঝতে পারে না ঠিক, তবে তাকে স্পর্শ না করলে সে যে বাঁচবে না, এও বোঝে— এই সব চিন্তায় সে সারা রাত ভাল করে ঘুমাতেও পারল না। অতি প্রত্যুষে ফের আমলকি গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তাকে আজ, যত বেহায়াই হোক সে তার লীলা, শরীর দেখিয়ে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবে।

জারুল গাছ পার হয়ে সরকার বাড়ির মাঠে ঢোকার মুখে তাকে আটকাবে। বাড়ির পেছনের কিছু বনজঙ্গল, ঠিক বনজঙ্গল না বলে আগাছায়

জায়গাটা সবুজ। তার পরে সেই জলা।

জলার সর্বত্র কচুরিপানা, কচুরিপানার ফুল, নীল, সবুজ, সাদা আর মেজেন্টা রঙে নিরবধি বর্ণমালায় অশেষ হয়ে আছে যেন, দূরে অদূরে গাছপালা। সে জারুল গাছের নীচে গিয়েও অপেক্ষা করতে পারে। কারণ সে তো নিশ্চিত, সজলকুমার আর পাঁচিল টপকে কুঠিবাড়ির মাঠ পার হয়ে সড়কে উঠে যাবে না। সরকার বাড়ির মাঠ ঘুরে সড়কে উঠে যাবে।

সে দূর থেকেই দেখছে, দু' পাশের কচুরিপানার ভিতর দিয়ে সজলকুমার হেঁটে আসছে, দু' পাশে তার হাঁটু পর্যন্ত কচুরিপানার ফুলে আড়াল করে রেখেছে সরু পথটা। যেন কোনও দৈবমায়ায় একজন পুরুষ ফুলের উপর দিয়েই হেঁটে আসছে। বোঝাই যায় না, ফুলের অন্তরালে থেকে গেছে সেই সরু রাস্তাটা।

কোনও পুরুষের জন্য এই অপেক্ষা, এবং এমনতর দৃশ্যের ভিতর যুবকের আগমন, সালোয়ার কামিজে শরীর ঢাকা নারী উতলা হয়ে থাকলে, শরীরে যে রোমন্থন শুরু হয়, সজলকুমার কি জানে।

কোনও রকমে সে ছুটে যেতে চাইল।

কিন্তু কেমন অবশ শরীর, পা তুলতে পারছে না, দৌড়াতে পারছে না।

সে কোনও রকমে টলতে টলতে কুঠিবাড়ির জলার দিকের পাঁচিল টপকাল, এবং পাঁচিল কোমর সমান উঁচু বলে সহজেই লাফিয়ে পার হয়ে যায়। শরীর যতই উতলা হোক, অবশ হোক, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

সামাজিক বাধা নিষেধ কিছুই সে ঠিক বোঝে না। সুন্দর অসুন্দর বোঝে না, তার মুখ দেখতে না পেলে, ছবিতে মুখের রেখা স্পষ্ট হবে না। ছবিটা চিত্রাক আঁকতে না পারলে সে যে মরে যাবে।

ছুটতে ছুটতে আরও কত কিছু যে ভাবছে— আমলকি গাছের নীচে, তারা বেদিতে বসবে। গাছটা ঘিরে সেই বেদি কোনও সংরক্ষণের জন্য, বাইরের শুভ অশুভকে প্রতিহত করার জন্য, সামান্য উঁচু বেদিটায় তাকে এনে বসাবে। তার পর বলবে, সজলকুমার এই আমলকি গাছের নীচে তুমি কেন অপেক্ষা করতে। কী খুঁজতে, কাকে খুঁজতে।

সজলকুমার এক দিন দেখল, ঘাস মাড়িয়ে বনজঙ্গল সরিয়ে সেই মেয়েটা প্রায় যেন উড়ে উড়ে আসছে।

হাওয়ায় তার সোনালি ফ্রক লেপ্টে যাচ্ছে শরীরে। খালি উরু যেন মেঘবতী হয়ে আছে— এত ফর্সা আর কমনীয় যে চোখ ফেরানো যায় না। —এক আশ্চর্য বিস্ময় খেলা করে, এবং নদীর কোনও জলরাশির মতো ঝড়ের কিনারে যেন আছড়ে পড়ছে।

মেয়েটি ঠিক জারুল গাছটার নীচে তাকে অবরোধ করে দাঁড়াল।

এই প্রথম, এত প্রত্যুষে এক ফুলের মতো পবিত্র নারীকে সে দেখছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সজলকুমার নড়তে পারল না।

কিছু বলতেও পারল না।

সে কেমন আহাম্মক হয়ে গেছে।

নারীর প্রশ্ন, তুমি কোথায় যাও এই প্রত্যুষে। এত সকালে যাও কেন! আঁধার সরে না অথচ তুমি যাও।

এমন প্রশ্নে সজলকুমার আরও ঘাবড়ে গেল। সে ভেবেছিল রুমালি তাকে প্রশ্ন করবে, আমলকি গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কেন! কুঠিবাড়িতে প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, তাই না! প্রজাপতির পাখা ছিঁড়ে খেতে খুব ভাল লাগে, না! বেহায়া নির্লজ্জ।

মেয়েটির ফর্সা গাল কথা বলতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে, সেও কিছুটা বিহ্বল। এই সুন্দর মুখে পাখির ডানার মতো কালো দুই ভুরু, নাক ঈষৎ উঁচু, চিবুকে ভাঁজ আছে, এবং কিছুটা গোল মতো, আবার মুখের অবয়ব অনুযায়ী লম্বাও মনে হয়, দেবী প্রতিমা যেন।

সে কথা বলতে পারছে না।

এও সত্যি, আমলকি গাছের নীচে সে প্রত্যুষে অপেক্ষা করত, যদি পর্দা সরে যায়। বেলেঘাটার এই বাড়িটাই যদি, সেই বাড়ি হয়, যেখানে বাপুজি অনশন করেছিলেন। কারণ এমন খিলান দেওয়া বাড়ি শার্সির জানালা, এবং সবুজ টেনিস মাঠের মতো নরম ঘাসের ক্ষুদ্র প্রান্তর, এবং বাগানে ফুলের সমারোহ না থাকলে বাপুজির অনশনে মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয় না। সে তো শুনেছে, বাপুজি এই অঞ্চলের কোনও বাড়িতে অনশন করেছিলেন, সেটা কোথায় সে জানে না, কিন্তু মামার সঙ্গে বস্তিতে উঠে আসার প্রথম দিনেই কেন যে তার মনে হয়েছিল, এই তো সেই বাড়ি! যথার্থই তার অনুমান সত্য কি না, এক সকালে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করেছিল। পর্দার আড়ালে তখন অন্ধকারে যুবতী আদৌ ভাস্বর ছিল না।

অবরোধ সরিয়ে যেতে চাইলে রুমালি হাত তুলে দিল।

সরো। আমার দেরি হচ্ছে।

না সরব না। আমার সঙ্গে এস।

কোথায়?

তোমাকে আমলকি দেব। গাছটার নীচে গিয়ে বসলেই দেখবে ঘাসের উপর হীরক খণ্ডের মতো দু'টো আমলকি পড়ে আছে।

হীরক খণ্ড!

আর কী, মনে করলেই হল।

তুমি এত সুন্দর কথা বলতে পার?

এস না।

রুমালি কত সহজে ফের হাত ধরে অনুনয় করল।

তার অস্বস্তি হচ্ছে। কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হবে। কোনও অনাত্মীয় কেন, সমবয়সি নিকট আত্মীয়ও তার হাত ধরে এ ভাবে অনুরোধ করেনি। যেন নিজের সম্মান রক্ষার্থেই বলল, ঠিক আছে হাত ছাড়ো। যাচ্ছি।

কী খুশি! বালিকার মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ছুটে যাচ্ছে।

এই মনোরমা কী চায়। প্রকৃতই কি তার মাথা খারাপ। না হলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে কেন? কেমন এক রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন এই কুঠিবাড়ি। সুরভিমাসির মুখে বাড়িটার অন্দরমহলের আভিজাত্যের কিছু খবর সে জানে। বড়লোকদের ডাইনিং স্পেস থাকে। ডাইনিং টেবিলে লম্বা মসৃণ টিক কাঠের ওপর সাদা চাদর পাতা থাকে। রোজকার চাদর পাল্টে দেওয়া হয়। চাদরটার চার পাশে থাকে লেসের কাজ, এবং মাঝখানে থাকে চিনেমাটির কারুকাজ করা ফুলদানি। ফুলদানিতে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ সাজিয়ে রাখা হয়। বাড়ির মেঝে আয়নার মতো ঝকঝক করে। রুমালি দিদিমণি যখন হেঁটে যায় প্রতিবিম্ব ভাসে তার।

বাড়িটা যে দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন। নানা গুজবও ছড়ায়। এবং মাঝেমাঝে জ্যোৎস্না রাতে কেউ যে বনের মধ্যে হেঁটে বেড়ায়, তারও খবর আছে।

জানালাটা তার দেখা হয়নি। সে গাছের নীচে বেদির পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে রুমালি বলল, বোসো না। কিন্তু রুমালি নামটা যেন মেয়েটার আভিজাত্যের সঙ্গে মানায় না। মনোরমা, মনোরমা বলতে বলতে সে বসে পড়ল।

কে মনোরমা!

তুমি।

ধ্যাৎ। তোমাকে কিন্তু আমি খামচে দেব সজলকুমার।

আরে আমি সজলকুমার নই, আমি সজল। রূপকথার রাজকুমারেরা সজলকুমার হয় বোঝো না।

না, বুঝি না। মেয়েটি মৃদু চিমটি কাটল।

আর সঙ্গেসঙ্গে সেই দেয়াল জোড়া আয়নায় মেয়েটির উবু হয়ে বসে থাকার দৃশ্য ভেসে উঠল তার চোখে। ভাবলেই শরীর কেমন উষ্ণ হয়ে ওঠে। কোনও নারী উবু হয়ে তলপেটের নীচে যেন কী খুঁজছে। সে ভেবেই পায় না কোনও মেয়ে নিজের শরীরে কিছু খুঁজে বেড়াতে পারে। কীসের কৌতূহল। সে যা বহন করছে, তার নিজেরই। নিজের শরীরেই তার সেই সুমধুর সজ্জা। জানুর সন্ধিস্থলে কতটা নেমে গেছে সেই সজ্জা, কিছুতেই যেন খুঁজে পাচ্ছে না। আয়নার সামনে বসলে সব ভেসে ওঠে। তবু খুঁজে পাচ্ছে না। যেন সে নিজেকেই নিজের মধ্যে খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সে উঠে পড়ল সহসা।

আমি যাচ্ছি।

কোথায় যাবে।

যাব এক সরোবরের পাড়ে।

কোথায় সেটা।

এখনও মাটি কাটা চলছে। সেই কবে থেকে বুঝি শুরু হয়েছিল। চার পাশে বিশাল ঘন পাহাড় হয়ে আছে।

সেখানে কেন যাবে? অন্ধকার থাকতে কেন যাও।

যাই, আমি যে পাহাড়ে উঠে যাই, নেমে আসি। দুধের ক্যানটা খাটালে রেখে, দৌড়ে নম্বর বাড়ির পাশের রাস্তাটায় ঢুকে পড়ি। দূরে অদূরে বড় বড় সব তালগাছ। সকালের সূর্যোদয়ের আগে দৌড়াই। শরীরে ঘাম হয়। ঘাম হলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যায়। হালকা হয়ে যায়। সূর্যোদয় হলেই ফিরে আসি। রাস্তায়, মাঠে বিশেষ লোকজন থাকে না তখন।

একটা কথা বলবে—

কী কথা!

আমলকি গাছের নীচে কী খোঁজো সজল!

যদি গাছতলায়, দু' একটা আমলকি পেয়ে যাই— রোজ একটা আমলকি খেলে পরমায়ু বাড়ে জানো?

সত্যি! এই নাও দু'টো আমলকি।

আমলকি!

আমি তোমাকে দিচ্ছি সজল।
কেন?
বন্ধুত্ব। কথা দাও তুমি পাঁচিল টপকে এই রাস্তায় আসবে যাবে। সকালে তোমাকে দেখলে আমারও পরমায়ু বাড়ে।
পরমায়ু বাড়ে মানে!
তোমাকে দেখলে আমার আনন্দ হয়। দুঃখ থাকে না। বিষণ্ণতা থাকে না।
সজল একেবারে হতভম্ব।
তুমি এ দু'টো রাখো মনোরমা। সজল আমলকি দু'টো ফিরিয়ে দিতে চাইল।
কেন! তোমাকে দিলাম। ফিরিয়ে দিলে বন্ধুত্বও ফিরিয়ে দিতে হয়। বন্ধুত্ব ফিরিয়ে দিলে আমার যে আর কোনও অবলম্বন থাকবে না।
ঠিক আছে, রাখছি।
আমিও যাব তোমার সঙ্গে।
তুমি যাবে কেন! তুমি বড় হয়েছ। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া মানায় না।
না, আমি যাব। জানো, একা ঘরে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না। বাবুজি আমাকে তীর্থদর্শনে সঙ্গে নিয়ে যায়। আমার বাবুজির সঙ্গে যেতে ভাল লাগে না। পাখিরা উড়ে গেলে আমার হিংসে হয়। চলো না, জঙ্গলে ঢুকে অনন্তের মন্দিরটা দেখে আসি। বাবুজির গুরুদেবের নির্দেশে সব হচ্ছে। আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না।
না, না। আর এক দিন হবে। জঙ্গলে মন্দির আছে?
সজল জোর হেঁটে যেতে থাকলে মনোরমা বলল, আছে।
কেউ তো বলেনি। আরে, আমার সঙ্গে আসছ কেন?
আমি যাব।
চোখে মুখে যাওয়ার তীব্র আকুতি মনোরমার।
তার শরীর জরিপ করার মতো কমলি তাকে দেখছে। মাঝে মাঝে কুঠিবাড়ির দিকে তাকাচ্ছে— কেউ বোধহয় ওঠেনি। উঠলেও সে কাউকে পরোয়া করে না। বাবুজি বলেছেন, তুমি বড় হও। গুরুদেব বলেছেন, বড় হলে যেখানে খুশি যেতে পারবে। বড় হলেই তোমার সব ফাঁড়া কেটে যাবে। এই বয়সটাতেই আমার যত ফাঁড়া।
মেয়েদের বড় হওয়াটা কী সজল!
শরীর না মন, সজল!
এই সব প্রশ্নে জেরবার হচ্ছে মেয়েটা। মেয়েটা বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে কেমন বিপাকে পড়ে গিয়ে বলল, তুমি যাও।
কিন্তু সে কিছুতেই সজলের পিছু ছাড়ছে না।
সজল ছুটতে থাকল।
কমলিও হরিণ-এর মতো ছুটছে।
সে খাটালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। খাটালের লোকজন উঠে পড়েছে। গরু, মোষ বের করে আনছে। খুঁটিতে শক্ত করে বেঁধে রাখছে।
সে ডাকল, পাঁড়েজি।
পাঁড়েজি কাছে এলে ক্যানটা দিয়ে ছুটবে ভাবল। আর তখনই কমলিও ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।
সজল কী যে করে! আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো মেয়েটা। পড়ে আবার লাগল কি না কে জানে! সে তাড়াতাড়ি তাকে তুলে বলল, লাগেনি তো!
আসলে সে খুবই গরিব বাবার ছেলে, এমন সুন্দর মেয়েটা, কথা নেই বার্তা নেই, তার সঙ্গে বের হয়ে এসেছে, কিছু হলে, ফুসলে ফাসলে নিয়ে যেতে গিয়ে আর সামলাতে পারেনি, এমন সব অভিযোগ তার বিরুদ্ধে উঠতেই পারে। সে ফের বলল, লাগেনি তো!
কোনও কথা বলছে না।
অথচ খুঁড়িয়ে হাঁটছে।
সে ভাবল ফিরে যাবে। কারণ সকালে ফেরার সময় সবার চোখে পড়ে যাবে। এখনও পড়ে যেতে পারে। প্রায় সমবয়সি হলেও তার মনোরমা ঠাকুরের কথা যতই বলুক, দুধওয়ালা কিংবা বকুল সিংহ যদি জানে, কিংবা ধরে ফেলে, তবে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যেতে পারে।
কারণ, খাটাল এবং তার পাশেও এদের যে লোকজন আছে, এরা একেবারে কাছে গেলে বাসিন্দা— ইচ্ছা করলে তাকে জেল হাজতেও পাঠাতে পারে।
তবে রক্ষা, তারা তাকে চেনে।
বাড়িটার সবাই তাকে জানে। যতই এক জন তান্ত্রিকের নির্দেশে মনোরমার এই জীবন, কিংবা সেই তান্ত্রিক গুরুদেব যতই মন্ত্রসিদ্ধ হন না কেন, আর যদি বাকসিদ্ধও হন, তার খুব একটা ক্ষতি করতে পারবেন না। সে কলেজে পড়ে, কলেজের বন্ধুবান্ধবরাই সাক্ষী দেবে যে, মেয়েটিই ইচ্ছা করে বের হয়ে এসেছে। বড়দিও তাকে চেনে, আদর্শ বালিকা বিদ্যাপীঠের হেডমিস্ট্রেস। তার দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার পর দিদিমণিকে দিয়ে খোঁজ নিয়েছেন— পরীক্ষা কেমন হল। তাকে নিয়ে গেছেও বলেছেন।
হকা সিং যে আসলে বকুল সিংহ। কারণ শিশু বয়সে সে কমলিকে দেখভাল করত, এখনও করে। এবং কমলিকে বেশি খাটানোর সাহস নেই তার, মনোরমাই একমাত্র তাকে হকাদাদু বলে। কিংবা কখনও মনোরমা বাড়িঘরের বিশৃঙ্খলা ঘটলে হকাকেই দায়ী করে, ভয়ও দেখায়, তুমি আর কী করবে, দাদু বড় হয়ে গেছে, বাগানে আগাছা, খালি পায়ে হাঁটা যায় না, খোঁচা লাগে। বাড়িটার পাঁচিল টপকে লোকজনকে যেতে দেখলেও মনোরমা যে খেপে যায় এবং মনোরমার মর্জি বুঝতেই তারা বাড়িটার পাশ থেকে ফুল তুলতে দেয় না। সেই মেয়েটা যদি বলে, আমি যাব তোমার সঙ্গে, সে বাধা দেয় কী করে! আর মনোরমা যে কাউকেই পাত্তা দেয় না। তার কোনও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেই সে খেপে যায়, তাও সে জানে।
খুঁড়িয়ে হাঁটছ কেন?
আমার ইচ্ছে।
আরে মেয়েটা কি তাকে মজাতে চায়!
তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমার সঙ্গে আসবে না।
কে কার কথা শোনে!
সজল দৌড়ায়, তাকে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলেই মনোরমা আর তাকে অনুসরণ করতে পারবে না। সে যেখানে এই প্রত্যুষে চলে যায়, জায়গাটা সে চেনে বলেও মনে হয় না। কাজেই মনোরমাকে ফেলে চলে গেলে কেউ কিছু তাকে বলতেও পারবে না।
সে যায়, আর পেছনে ফিরে তাকায়।
এ দিকটায় বাজার। লক্ষ্মী ভাণ্ডার পার হলেই সেই রাস্তা। নস্কর বাড়ির পাশ দিয়ে এই রাস্তাটা। একটা তালবনের ভিতর ঢুকে গেছে। কিছু নতুন নতুন পাকা বাড়ি উঠছে— দোতলা-তিনতলা বাড়িও আছে, তবে রাস্তার শেষ দিকটায় আর কোনও বাড়িঘর নেই।
আরে কে বলবে, মনোরমার পায়ে লেগেছে— যেন তার কিছুই হয়নি।
ইস, এত জেদ!
সে থেমেও পারে না।
কাছে এসে বলল, আমি যাব তোমার সঙ্গে। তোমার কোনও ক্ষতি করব না। মনোরমার এই কাতর অনুরোধকে কেন যে সে উপেক্ষা করতে পারে না।
আমি তো সেখানে দৌড়াই। চার পাক ঘুরি। তোমার পায়ে লেগেছে, অতটা কি হাঁটতে পারবে। ফিরতে বেলা হবে।
হোক গে।
আমার সঙ্গে কেউ দেখলে কী ভাববে বল তো!
আসলে সজল যে তার মামার কাছে থাকে, এই বয়সে একজন তরুণীর সঙ্গে বস্তির কেউ দেখে ফেললেও তাকে খারাপ ভাবতে পারে। সে তো কারওর কাছে ছোট হতে চায় না। সে এই শহরে পড়াশোনা করতে এসেছে। তার ভবিষ্যৎ কী সে জানে না। যতটা পারছে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করছে। তার ঘাড়ে দায়ও কম না। ছোট বোন লক্ষ্মী এর মধ্যেই ফনফন করে কলাগাছের মতো বাড়ছে। ভাইগুলো স্কুলে যায় ঠিক, তবে যেতে হয় বলে। বাবা-মা'র মধ্যে অভাবের জন্য মধ্যেই তিক্ততাও আছে। সংসারে টাকা পয়সার খুবই দরকার। সে ইচ্ছে করলেই মনোরমাকে নিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখতে পারে না।
মনোরমা যে এ ভাবে তার সঙ্গে বের হয়ে এসেছে, মাথায় গোলমাল যে সত্যি আছে, কারণ মনোরমার পক্ষে এই বের হয়ে আসা, বিন্দুমাত্র স্বাভাবিক ঘটনা নয়, কাজেই মনোরমাকে নিয়ে তার স্বপ্ন দেখলেই চলবে কেন!
সে বলল, গাছটার নীচে বসো।
তুমি কী করবে?
দেখো না, কত বড় বড় ঢিবি। ঘাস গজিয়ে পাহাড় হয়ে গেছে। তার পেছনেই সেই সরোবর তৈরি হচ্ছে।
মনোরমা বলল, ধুস, পাহাড় এ রকম হয় না।
কী রকম হয়!
এক নীলাভ আকাশ এবং গাছপালা, আর নুড়ি পাথর, ইয়া বড় বড় পাথর, খাদ, চোখ গেলে মাথা ঘুরে যায়। পড়ে গেলে খোঁজ পাওয়া যায় না। খচ্চরের পিঠে করে যেতে হয়। কখনও গভীর অন্ধকার, সরু পথ, দু' পাশে দেওদার, মেহগিনি, আরও ওপরে উঠলে শুধু পাইন গাছ, শীতে বরফের পাহাড়, লাল শৃঙ্গ। শৃঙ্গের মাথায় দেবদেবীর মন্দির। পাশে রেস্ট হাউস। হোটেল, কত রকমের ব্যবস্থা। শীতের বরফ পড়া কিংবা তুষারপাত আশ্চর্য এক স্বপ্ন তৈরি করে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে।
এত সুন্দর যার কথা, আর আশ্চর্য সব বর্ণনা সেই পথের, তাকে কি

কখনও মানসিক ভাবে শুরু, ভাবা যায়।

তুমি গেছ মনোরমা! সজল আজ কেন জানি এই মনোরমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। এ বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরার ইচ্ছা। তার এই ইচ্ছা কখনও যে ভাল হতে পারে না।

যাব না কেন। হেমকুণ্ডে আমার বাবুজি থাকেন।

বাবুজি!

আমার বাবা।

একাই থাকেন!

একা থাকবেন কেন, সেখানে একা থাকা যায় না।

বাবার গুরুদেব তত্ত্বসাধক সর্বেশ্বরানন্দ থাকেন।পাশেই লক্ষ্মণ মন্দির। লক্ষ্মণ, মেঘনাদ বধ করে যে পাপ করেছিলেন, সেখানে সাধনা করে তিনি পাপ মুক্ত হয়েছিলেন। মন্দিরের সামনে এক বিশাল সরোবর। যত দূর চোখ যায়, শুধু বরফ। শ্বেতশুভ্র এক নদীর উৎস সেখানে গেলে খুঁজে পাবে। সারা বছর বরফে আচ্ছাদিত সরোবর, পাইন বন এবং ঘাসপাতা বরফ পড়ে পড়ে ধবধবে হয়ে আছে। আর পশ্চিমের জানালায় চোখ রাখলে, উপত্যকাময় শুধু ফুল আর ফুলের রেণু উড়ে বেড়াচ্ছে। তুষারপাতের সময় ফুলের রেণু তুষার ঝড়ে উড়তে থাকে।

সে বলল, ঠিক আছে তুমি বোসো এখানে। যাবার সময় নিয়ে যাব। কোথাও কিন্তু যাবে না। চার-পাঁচটা চক্কর, তার পরই ফিরে আসব।

কত তালগাছ না!

সবই কেটে ফেলেছে। দু'একটা দাঁড়িয়ে আছে— এক বিশাল প্রান্তর বলা যায়। সরকার এখানে অতিকায় সরোবর তৈরি করছে। মানুষের যে বেড়াবার জায়গা চাই।

তুমি আমার পাশে বোসো সজল। আজ না হয় চক্কর নাই মারলে!

সে এক বার ভাবল চলেই যাবে। তার সব ভণ্ডুল করতেই বাড়ি থেকে মেয়েটা লাফিয়ে বের হয়ে এসেছে। দেরি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি। বাড়ির লোকজন বের হয়ে পড়তে পারে। কোথায় এত সকালে নিখোঁজ হয়ে গেল মনোরমা। তারা এমন ভাবতেই পারে। তাদের দোষও দেওয়া যায় না।

ওঠো।

কেন।

ওঠো না।

পায়ে আমার লাগছে না! উঠব কী করে। ধর আমাকে।

আচ্ছা বিপদ!

কই হেঁটে আসার সময় তো পা খোঁড়াচ্ছিলে না। এখন বলছ ধরতে হবে।

ধরতে হবে না। বলেই সামনের ঢিবির ওপর দৌড়ে উঠে গেল মনোরমা।

সজল অবাক। তাকে নিয়ে মজা করছে মেয়েটা, সে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। একাই ফিরে যাবে। সেই কুঠিবাড়ি ফিরে হুকুম সিংহকে খবর দেবে, দেখগে তোমাদের সোহাগি দিদিমণির কাণ্ড। সরোবরের ঢিবিতে একা দাঁড়িয়ে আছে।

আর তখনই বিপদের আঁচ পেল। সে দৌড়ে ঢিবির মাথায় উঠে যাচ্ছে—

এই, এই, শোনো। ইস কী করছে, আর এক পা এগোলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে— আরে পিছনে তাকাও। আমাকে ভেংচি কাটছ কেন! পড়ে গেলেই অতলে। এই বিশাল জলাশয়ে ডুবে গেলে কি ভাল হবে তোমার!

কে শোনে কার কথা।

সে দ্রুত দৌড়ে হাত ধরে ফেলল মনোরমার।

দেখ নীচে কী আছে?

মনোরমা কিছুই দেখল না— সে জড়িয়ে ধরল সজলকে। গালে মুখে চুমু খেতে থাকল। আমি বড় হয়ে গেছি কবেই। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধর। হাত দিয়ে দেখো, আমি ঠিকঠাক বড় হয়েছি কি না?

ও না গেলে আমি কী করব! বিনয় যে বিরক্ত তার কথাবার্তাতেই বোঝা যায়।

সুরভি বলল, ছেলেমানুষ, ওর ওপর রাগ করলে তোমার হবে! বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওর মামাকে এক বার বলে দেখো যদি রাজি করাতে পার।

তুমিও যেমন সুরভি। আর লোক পেলে না। মামাটির যা চরিত্র, সে কি তার মামাকে তোয়াক্কা করে! বড়দি আমার কত বড় সম্বল ছোঁড়াটা তার কিছুই জানে না। বড়দিই বলল, কিছু ধূপের প্যাকেট আমার কাছে রেখে যাবে। স্কুলের দিদিমণিরা আছে, ছাত্রছাত্রীরা আছে। পাঁচ-সাত ডজন ধূপের প্যাকেট আমার অফিসে রেখে দাও। গার্জিয়ানরাও দেখা করতে আসে। অফিসে আমার ঘরে তোমার ধূপকাঠি জ্বেলে রাখি। ভারী সুঘ্রাণ। মানুষের উপকারের সুযোগ পেলেই হল বড়দির।

বড়দির কী দায় পড়ল বুঝি না! ভাগ্নে তো ওঁর কেউ হয় না।

দেখো সুরভি, কে যে কীভাবে মানুষের উপকারে লাগে আমরা জানি না। জীবনের কী আদর্শ থাকে কার, তাও আমরা জানি না। বড়দিকে দেখলে মনে হয়, কারও উপকার করতে পারলেই তিনি খুশি।

সজল কী বলে!

কী বলবে ছোঁড়া। চুপচাপ হয়ে গেছে কেমন।

কেন?

কী করে বুঝব বল। বড়দি এত করে বলেছে— তোমার সেই বন্ধুর খবর কী? পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হয়ে গেল! ওর পাত্তা নেই।

সজল কী বলে? সুরভি প্রশ্ন না করে পারল না।

সজল তো বলল, সে মার্কশিট এখনও পায়নি।

রেজাল্ট যে খুবই ভাল হয়েছে, বড়দি তাও বলেছে। বড়দির কাছে ওর রোল নম্বর আছে। সজলই দিয়েছিল।

সজল বোঝে না, মানুষই মানুষের উপকার করে। সে তো কোথায় কোথায় যায়, দুধ নিয়ে বেলা করে ফেরে। আর এসেই তক্তপোষে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। ডাকলেই বলে, আমার শরীর ভাল না। যেতে ইচ্ছে করছে না। সময় হলে ঠিক তোমার সঙ্গে এক দিন চলে যাব। তার না কি সময়ই হচ্ছে না।

এক সকালে গোপাল সবে ফ্যাক্টরি থেকে ফিরেছে। হাত-মুখ ধুয়ে পিঁড়িতে বসে আছে। স্টোভে চা করছে পারুল। বিনয়কে দেখেই গোপাল দরজায় মুখ বাড়াল—তার পর তার দিকে তাকিয়ে বলল, বসো বিনয়। পারুল আর এক কাপ জল কেতলিতে দিয়ে দাও। বিনয় এসেছে।

তার পর যা স্বভাব গোপালের, বিড়ি বের করে একটা বিনয়কে দিল, নিজে একটা ধরাল, বিড়ির মৌতাত—এবং চা-ও এসে গেছে। ভাগ্না ঘরে নেই, দুধ আনতে যায়, এবং নস্করবাড়ির মাঠে অনেক ক্ষণ দৌড়য়।

বিনয় বলল, তুমি গেছ ও দিকটায়।

কোন দিকের কথা বলছ।

আরে ওই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে নিয়ে হেম নস্কর নির্বাচনী সভা করেছিলেন যে মাঠটায়—

মাঠটা কি আর আছে? ওটা তো খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে। লেক হবে। বালিগঞ্জের লেকের মতো, কত বড় মাঠ, তালের বন, কত দূর যাওয়া যেত। শহর বাড়ছে অথচ আমরা গরিবেরা যেন এ দেশের কেউ না। বাধাও দিচ্ছে না কেউ।

বাধা দেবে কেন?

কেন আমাদের কী কোনও দাবি নেই। আমরা কি এ দেশের মানুষ না। জলার বস্তি উচ্ছেদ করে, সেখানে কি গরিবদের জন্য ঘরবাড়ি বানানো যায় না?

গোপাল সম্প্রতি খুবই কম্যুনিস্ট মার্কা কথাবার্তা বলে। বিনয়ের হাসি পায়, যে ফের শনিবার ত্রিনাথের মেলা বসায়, এবং যার চেলা চামুণ্ডার অভাব নেই, আড্ডা-খিস্তি পারিবারিক অনুশাসনকে যে আদৌ তোয়াক্কা করে না— পারুল কোনও চেলা চামুণ্ডার সঙ্গে হেসে কথা বললেও দোষ, শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত কথাবার্তা, এবং এই সব কথাবার্তায় এতই বেশি যৌনবিকৃতির ছাপ থাকে যে কানে আঙুল না দিলে চলে না।

সজলের জন্য বিনয়ের এ জন্যই যত আক্ষেপ। মামা-ভাগ্নের এই চারিত্রিক তফাত তাকে মর্মাহত করে। বড়দি ডেকে পাঠিয়েছেন, যে করেই হোক তাকে নিয়ে যাওয়া দরকার। বড়দি মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

একটা কথা আছে গোপাল। সজল কোথায়? তাকে দেখছি না। বিনয় না বলে পারল না।

আসবে, এখুনি চলে আসবে। একটু থেমে কী ভেবে বলল, হঠাৎ সজল! সে কি তোমার সঙ্গে বের হবে?

শোনো গোপাল, তোমার ভাগ্নাকে বড়দি ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাবা ও সব মেয়েছেলের সঙ্গে ও দেখা করবে না। সে কত বড় বংশের ছেলে তুমি জানো, এ দেশে এসে না হয় তার বাবা জলে পড়ে গেছেন।

শোনো গোপাল, সব কথায় মাথা গরম করতে নেই— বড়দি এখানকার আদর্শ বালিকা বিদ্যাপীঠের বড়দিদিমণি। বড়দির দাদা কাগজের রিপোর্টার। মেসোমশাই রেলে কাজ করতেন। খালপাড়ের কাছে বাড়ি। বেশি দূর না,

বেঁচেই থাকা যায়।

হাঁ, জানি। ভায়া সব বলেছে আমাকে। তোমাকে তাকে আসন পেতে চা খেতে দিয়েছিল, শহরের এই সব মেয়েছেলেদের আমার তাই চিনতে বাকি নেই। ফাঁদ পেতে শিকারের আশায় বসে থাকে।

তুমি কী বাজে বকছ গোপাল!

ভায়া বলেছে সব।

ভায়া কী বলেছে তোমাকে।

ভদ্রমহিলা খুব আদর যত্ন করে তাকে খাইয়েছেন।

আর কিছু বলেনি?

হ্যাঁ বলেছে। জানো মামা, কী সুন্দর ফুল তোলা আসনে বসিয়ে খুবই যত্নে তাকে খাইয়েছে।

ওর মামিই বলল, আসন কেন, এ সব লোকেরা তো টেবিল চেয়ারে খায়।

সজল ভদ্র মহিলার প্রশংসায় এত পঞ্চমুখ যে, পারুল না বলে পারেনি, তোকে খাওয়াল আর অমনি গেলি। কার মনে কী আছে জানিস। আমি বলে দিয়েছি সজলকে, কারও খপ্পরে পড়ে যাবে না। কিছু হলে তোমার বাবাকে মুখ দেখাব কী করে। শহরের মেয়েছেলেদের বিশ্বাস নেই।

বিনয় ক্ষেপে গিয়ে বলল, দুবুদ্ধি শালা, মন তোদের এত ছোট। পয়সাওয়ালা সব মানুষই কি খারাপ হয়। সজলের যে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে জানিস?

না, জানি না তো। এই সজল, সজল আসেনি।

যাই মামা।

তোর পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে?

হয়েছে তো।

পাস করেছিস!

করেছি।

আর সঙ্গেসঙ্গে গোপাল চক্রবর্তী লাফিয়ে উঠল, এত বেশি উত্তেজিত যে লুঙ্গি প্রায় কোমর থেকে খসে পড়ে আর কী। বাইরে বের হয়েই চিৎকার, আরে দেখতে হবে না, তুই কার ভাগ্না। এত বড় খবরটা আমি জানি না। আমার কষ্ট হয় না, সবাই জানে, বিনয় জানে, আর আমিই জানি না। রক্ত, বংশের রক্ত, এই বিনয় শিগগির যা, মিষ্টি নিয়ে আয়। বলেই ট্যাঁক থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে ঘুরে ঘুরে হিসেব করে কত হয়, শোন বিনয় গুনে গুনে মাথা পিছু একখানা রসগোল্লা নিবি, বোঁদে নিবি এক কেজি—মনে থাকবে!

আমার সময় হবে না। তুমি যাও, নিয়ে এসগে, আমাকে বের হতে হবে। এই সজল চল আমার সঙ্গে।

কোথায়? সজলকে নিয়ে বের হয়ে যাবে শুনে, গোপাল কেমন তটস্থ হয়ে উঠল।

সজল তোমার শরীরের অজুহাত চলবে না। মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখো। ভালবাসা না থাকলে যে সব মরুভূমি। বুঝিস! মানুষের প্রতি এত অবিশ্বাস থাকলে হয়!

গোপাল বলল, কাল না হয় যাবে।

না আজই। মার্কশিট পেয়েছিস?

কাল নিয়ে এসেছি মামা।

বড়দি মার্কশিট দেখতে চেয়েছেন। দেরি করিস না। বড়দির স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে। জানিস তো, বড়দির দাদা খুবই জাঁদরেল রিপোর্টার। তোর রোল নাম্বার বড়দি ওঁকে দিয়েছিলেন। রেজাল্ট আউটের দিনই, খবর নিয়ে এসেছিলেন, মিনু, তোর ওই ধূপকাঠি ফেরিয়ালা দারুণ রেজাল্ট করেছে।

বড়দি তাঁর দাদাকে গালমন্দ করেছে জানিস!

গালমন্দ কেন?

বা এই যে ফেরিয়ালা, না ধূপকাঠি বিক্রেতা বলে তোকে ছোট করতে চেয়েছিল, বড়দি মানবে কেন, মানুষ কখনও ছোট হয় দাদা, ধূপবাতি বিক্রি করলে মানুষ ছোট হয়!

ছোট হয় না ঠিক, তবে আমরা তো এতটা উদার হতে পারি না, তুই কি পারিস।

কেন পারব না দাদা?

না পারিস না, পারলে, বারান্দায় আসন পেতে খেতে দিতিস না। বারান্দায় টেবিল চেয়ার সবই ছিল।

মিনু অর্থাৎ মিনতি অত ভেবে কিছু করেনি। সজল ছেলেমানুষ, দেখলে কেমন মায়া হয়। পোড়া রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিনয়, সঙ্গে ছেলেটি—মিনতির মায়া হতেই পারে—এবং বারান্দায় আসন পেতে সামান্য জলখাবার খাইয়েছে, দোষের কী বোঝে না।

কেন মেঝেতে, কেন টেবিলে নয়।

অত চিন্তা ভাবনা তার মাথায় ছিল না।

রিপোর্টার দাদাটি না বলে পারেনি, আসলে তুই আমার কথা, কিংবা বাবার কথা ভেবে, বাবা কী মনে করবে, ধূপবাতি ফেরি করে বেড়ায় এমন দু'জন যুবককে, কিছুতেই যে টেবিলে খেতে দেওয়া যায় না, আভিজাত্য তোকে তাড়া করেছিল। দু'জনের মধ্যে এই খাওয়া নিয়ে একটা বেশ মজার তর্ক বলা চলে, অথবা মিনতিকে ক্ষেপিয়ে তোলা, কিংবা বলা যায়, যতই খোলা মনের হও কোথাও না কোথাও ব্যবধান ঠিক ধরা পড়ে যায়।

আসলে যেমন সজলের মামা-মামি কিংবা বস্তির মানুষজন, বাবুদের কিছুই ভাল চোখে দেখে না, তেমনি, মিনতি কিংবা তার দাদা, এমনকী ভাইঝি এবং বাড়ির সবাই কোথাকার দুই ফেরিয়ালাকে, যতই চেনা জানা হোক, কিংবা মায়া, এবং মমতা মানুষের জন্য থাকে ঠিক, তবে তাদের জন্য আসনের ব্যবস্থার চেয়ে টেবিলে খেতে দেওয়ার কথা কিছুতেই ভাবা যায় না। টেবিলে দিলে কি বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যেত না!

বিনয় ভাবল, সজলের মধ্যেও সেই ঘুণপোকা কি নড়ছে!

না হলে সে যেতে চাইছে না কেন!

বিনয় অগত্যা বলল, আরে তোকে অনেক পথ হাঁটতে হবে সজল। এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি ধরতে নেই। এখন মানুষ এমনিতেই সম্পর্কহীন হয়ে যাচ্ছে। বড়দি তোকে ডেকে কথা না বললে তার মহাভারত কী অশুদ্ধ হয়ে যেত! তোর মামা-মামির মন ছোট, ওদের কথায় গুরুত্ব দিস না।

সজল কিছুই ঠিক বুঝতে পারছে না। সে মরছে নিজের জ্বালায় এবং কুঠিবাড়ির মনোরমা তাকে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ঢিবির মাথায় যা করল, অর্থাৎ যে ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে, সে কিছুতেই সেই ঘোর থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। তার ভালও লাগছে না কিছু, এমনকী সে যে দারুণ রেজাল্ট হয়ে গেছে, সে চাকরি করলে বাবার অভাবের সংসারে কিছুটা সুরাহা হয়, এই রকম কিছুও সে ভাবছে না।

মনোরমার চোখে জল।

কেন তার চোখ থেকে টপ টপ করে জলবিন্দু গড়াচ্ছিল। মনোরমার এমন পবিত্র ইচ্ছাকে সে কী যথেষ্ট তুচ্ছ ভেবে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। এবং মনোরমা ঢালুতে গড়িয়ে পড়লে সেও নিচে ছুটে যাবার সময় দেখেছিল, মনোরমার ঘাঘরা ওপরে উঠে গেছে। উরুস্থলে ভেসে উঠেছিল তার যৌনতার অবয়ব।

সে ভাবছিল ক'দিন থেকে, মনোরমার মাথা খারাপ না তার মাথা খারাপ। এই বয়সে রতি সুখের জন্য এমন কোন পুরুষ আছে যে পাগল না হয়ে থাকে। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়, এবং সে বোঝে তার পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে আছে। কেমন পাগল পাগল লাগে। চুপি চুপি উঠে সে বের হয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে এই কচুরিপানার গভীর জলা থেকে হেঁটে যায়, এবং মনোরমাও যদি তার সেই জীবনের দোসর আমলকি গাছটার বেদিতে বসে থাকে সেই আশায়।

বোধহয় মনোরমার নিরাপত্তার রক্ষার্থেই বাড়ির চার পাশে আলো জ্বালা থাকে, কেমন মায়াবী এক অতিশয় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো এই গ্রহে কুঠিবাড়িটি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। সে জারুল গাছের নীচ থেকে প্রত্যক্ষ করে, কোনও ঘোরের মধ্যে মনোরমা যদি বেদিটায় বসে থাকে।

বসন্ত কাল পার হয়ে যাচ্ছে।

গাছপালার পাতা ঝরা শেষ। তবু দু'একটি পাতা যে চৈত্রের বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে না, হলফ করে সে কথা বলা যায় না।

একজন মহান তস্করের মতো তার এই অভিসার।

কারণ প্রকৃত পক্ষেই সে আর কুঠিবাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না।

হুকুম সিংহ এবং দুঃখপ্রসাদের কড়া নজর কত বিস্তৃত, কারণ গড়িয়ে পড়ার সময়ই সে দেখেছিল, তালগাছের আড়াল থেকে দু'জনই ছুটে আসছে—

চেঁচাচ্ছে—দিদিমণি, ঢিবি থেকে গড়িয়ে পড়লে কীভাবে!

দুঃখপ্রসাদ চেঁচাচ্ছে, মাইজি পড়ে গেছে। মাইজি পড়ে গেছে!

ঢিবির আড়াল থেকে সে দেখছে—

ঘাঘরা টেনে দিচ্ছে মনোরমা। উঠে বসেছে। ঢিবির মাথায় মনোরমা তাকে খুঁজছে। তাকে ফেলে সজল পালাতেও পারে না। তার যে কোনও দোষ নেই, সে যে ফুসলে ফাসলে নিয়ে আসেনি, প্রত্যুষের এই সময় তার সাথী। কুয়াশায় কিছুটা যে আড়াল থেকে যায়, দূর থেকে ঢিবির মাথায় মনোরমার অবদমিত ইচ্ছানুসারে স্খলন অলক্ষ্যেই স্থির হয়। কেমন পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলে স্তনের অগ্রভাগে সজলের হাত নিয়ে মাখামাখি করার চেষ্টা সজল বাধা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না, রতিভিক্ষার জন্য

এমন অস্বাভাবিক যৌনচারিণী হয়ে ওঠা—সে কী যে করে—উপায়ান্তর খুঁজে না পেলে যা হয়, বাধ্য হয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

তখনও তার শরীরে মনোরমা অবলম্বন খুঁজছিল, প্যান্টের ফাঁক থেকে তার পুরুষাঙ্গটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

সে কোনও রকমে কোমর সরিয়ে বলেছিল, কী হচ্ছে, ছিঃ তুমি কী পাগল—কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারির শেষ আছে!

এবং ঠেলে দেবার সময় দেখেছিল, মনোরমার চোখে জল।

কেবল বলেছিল, সজলকুমার তোমার ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে হয় না। আমি কত বড় হয়ে গেছি—

না, অবশ্য ঘোরের মধ্যে সজলেরও সব কিছু স্পষ্ট মনে নেই।

সঙ্গেসঙ্গে মনোরমার ঠোঁট বেঁকে গেল।

সজলকুমার আমি তোমাকে ভালবাসি, সজলকুমার।

এ কথা বলার সময়ই তার হাতের ঠেলা খেয়ে পড়ে গেল মেয়েটা।

কিছুই সে প্রায় বলতে গেলে মনোরমার জানে না। উড়ো খবর কিংবা গুজবের তো কোনও ভিত্তি থাকে না। মেয়েটা কীসের ভিত্তিতে এতটা নাছোড়বান্দা, সে তাও বোঝে না। কিন্তু চোখের জল তো মিছে কথা বলে না।

আর কেন যে সজল সেই থেকে এক অপরাধবোধে আক্রান্ত।

সে তো আজকাল প্রায় সময়ই ঘরে থাকে না। কোনও চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকে। না হয়, খালপাড় ধরে হেঁটে যায়। দু' পাশে বিশাল সব বৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকে। তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, বৃক্ষ তুমি কার?

আগে ছিলাম রাজার।

এখন?

এখন তোমার।

সে বৃক্ষের ছায়ায় বসে নিজের সঙ্গে কথা বলে। বৃক্ষের সঙ্গেও কথা বলে।

তুমি বৃক্ষ কত কাল থেকে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ। অজস্র ডালপালা মেলে দিয়েছ, প্রতি শীতে পাতা ঝরে গেছে তোমার। ডালপালায় পাখিরা বাসা বানিয়েছে, ডিম পেড়েছে, ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়েছে, বড় হয়েছে, তার পর উড়ে গেছে তারা। কুঠিবাড়ির মনোরমাকে তোমরা চেন? হুকুম সিং কিংবা দুঃখপ্রসাদকে। তুমি কি জানো, মেয়েটি রতিভিক্ষা করতে এসেছিল। আমি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। এতে কি আমার কোনও পাপ আছে।

বৃক্ষের হাওয়ায় ডালপালা নড়ে উঠল।

ছলনা থাকলেই পাপ।

ছলনা কেন! আমি তো কোনও ছলনা করিনি বৃক্ষ।

মেয়েটাকে এক পলক দেখার জন্যই তো আমলকি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ওটা তো আমার কৌতূহল, এত বড় কুঠিবাড়িতে এমন একজন আশ্চর্য তরুণী বড় হয়ে উঠছে, কেমন রূপকথার গন্ধ টের পেয়েছিলাম বৃক্ষ।

আসলে সজল প্রথম দর্শনেই তাকে তুমি ভালবেসে ফেলেছিলে। সজল কেন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলে? ভাগ্যিস নরম ঘাসের মধ্যে মেয়েটা পড়েছিল, রুক্ষ ঊষর মাটিতে পড়লে কী হত বল তো।

কিন্তু তাই বলে, প্রকাশ্য দিবালোকে?

তখনও কিন্তু সজল পুব আকাশ ফর্সা হয়নি। কুয়াশার মধ্যে মেয়েটা তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল—আর যৌনতার যে কোনও শেষ থাকে না সজল। যৌনতার যে কোনও সময়ও থাকে না। সতী-সাধ্বী জীবন কত বড় মিছে কথা সেটা বোঝো না। নারী পুরুষের রমণই জীবন সৃজনের জন্য দায়ী। তা কখনও অশ্লীল হয়!

বৃক্ষের কথা আর সে শুনতে পায় না।

আবার কে যেন বলে শ্লীল-অশ্লীল বলে কিছু নেই সজল। সবে যাত্রা শুরু, জীবন কত নদী-ঘাট অতিক্রম করে আরও গভীরতায় ঢুকে যেতে চাইবে, মনে রেখ মেয়েটি সর্বস্ব দিয়ে তোমাকে ভালবাসতে চায়। রমণের মধ্যে সে তার জীবনকে বহন করতে চায়।

তখনই বিনয়মামা বলল, চল নামি। এসে গেছি।

বাস থেকে নেমে গলিটায় ঢোকার মুখে বিনয় বলল, বড়দিকে প্রণাম করিস। প্রণাম করলে যে-কোনও মানুষই বিগলিত হয়ে পড়ে সজল।

সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। বৃক্ষের কথাই কেবল এখনও শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায়, বাসে সর্বত্র বৃক্ষের ঘোর।

বিনয় ফের বলল, কী হল দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? আয়। বাড়ির সদর দরজায় ঢুকে বিনয় বেশ চেঁচিয়ে বলল, বড়দি আপনার আসামি হাজির। আরে তুই দাঁড়িয়ে থাকলি কেন, ভিতরে আয়।

সজল বলল, ইস কী করছ না বিনয়মামা।

আয় না তুই।

কোথায় বড়দি! সজল দেখছে এক বালিকা দাঁড়িয়ে আছে, মাধবীলতার কুঞ্জে। শাড়ি পরে স্কুলে যাবে বলে সিঁড়ি ধরে নামছে। নীলপাড় শাড়ি, নীলরঙের ব্লাউজ, এবং পায়ে কেডস। বিনয়ের দিকে চোখ তুলে মেয়েটি বলল, পিসিমা আপনাদের বসতে বলেছেন। তার পর বের হয়ে গেল। বিনয় বলল, সুব্রতা, বড়দির ভাইঝি।

ভেতর থেকেই কথা ভেসে আসছে।

বড়দিরই গলা।

তোমরা বসার ঘরে অপেক্ষা কর। আমি যাচ্ছি।

কাজের মেয়েটি বারান্দায় বের হয়ে বলল, আসুন।

বসার ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। ডিভান, সেন্টার টেবিল, সোফা এবং দেয়ালে মহাত্মা আর রবীন্দ্রনাথের বড় ছবি। বসার ঘর এতটা জায়গা জুড়ে হয় সজলের ধারণাই ছিল না। সে খুবই অবাক হয়ে গেছে। ঘরে কেউ কিছু এইমাত্র স্প্রে করে গেছে, এ জন্য সুঘ্রাণ যথেষ্ট।

কাজের মেয়েটি কখন চলেও গেছে।

ওরা দু'জন সোফায় বসতে ইতস্তত করছে।

কারণ ওরা দাঁড়িয়েই ছিল।

বড়দি না ঢুকলে, কিংবা না বললে বোধহয় বসা উচিত হবে না।

তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, বসো। বড়দি হাজির।

বিনয় সজলকে চোখ টিপে দিল।

সঙ্গেসঙ্গে সজল নুয়ে প্রণাম করতে গেলে বড়দি বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, যা হোক তুমি যে এলে! আমি স্কুলে যাচ্ছি না। ছুটি নিয়েছি। কোনও তাড়া নেই। দাঁড়াও আসছি।

বড়দি যে দিক থেকে ঢুকেছিলেন, সে দিকেই চলে গেলেন।

বিনয় কিছুটা ক্ষিপ্ত, আরে প্রণাম করে মার্কশিটটা হাতে দিবি তো!

তিনি তো আসছেন, তিনি কি উধাও হয়ে যাবেন, এত তাড়া কেন তোমার বিনয়মামা।

সত্যি তো সজল তো তার নিজের ভাগ্না নয়, যেন এত বড় সুযোগ হারালে তারই ক্ষতি হবে।

সজল দেয়ালের মসৃণ রং দেখতে দেখতে বাড়ির আভিজাত্য টের পাচ্ছে। বারান্দা থেকে বোঝাই যায় না, ভিতরের দিকে মেলা ঘর আছে, মানুষজনও আছে। তখনই একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ চুরুট ধরিয়ে ভিতরে ঢুকে সোফায় বসলেন—তার পর আঙুল তুলে বললেন, তুমি বিনয়?

আজ্ঞে।

তার পর সজলের দিকে আঙুল তুলে বললেন, তুমি সজল।

আজ্ঞে। বলেই সে প্রণাম করতে গেলে বললেন, তোমার তো দারুণ রেজাল্ট। কোথায় থাক?

বিনয় বলল, আমাদের পাড়ায় থাকে।

ওর বাবা কী করেন?

ওদের বাড়ি নদিপুরে। এখানে মামার কাছে থাকে।

সজলের দিকে তাকিয়েই বললেন, তোমার মামা কী করেন?

কাশীপুর গানসেলে কাজ করে।

তার পরই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

কিছু ক্ষণ পর কী ভেবে বললেন, দেখি মার্কশিট। এবং মার্কশিট দেখে বললেন, পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে তো। যা নম্বর সব কলেজই লুফে নেবে।

কাচুমাচু গলায় সজল বলল, আমার আর পড়াশোনা হবে না স্যার।

কেন! কেন!

যদি কোথাও কাজে ঢুকে যেতে পারি, ভাল হয়।

বড়দির নিশ্চয় সেই দাদা, যিনি সাগ্রহে অফিস থেকেই রেজাল্ট আউটের দিন পাশের খবর নিয়ে আসেন।

কিন্তু তিনি হা-হা করে হেসে উঠলেন কেন?

তোমার ভাই চাকরি হবে না।

এ বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নম্বরগুলো সব দেখলেন, দেখতে অসুবিধা হওয়ায় বোধহয় দু'-দু'বার কাচ মুছলেন, তার পর দুম করে বলে ফেললেন, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। নম্বর যা তাতে কলেজে প্রথম দিকেই র‍্যাঙ্কে থাকবে— অজিতেশকে বলে দেব।

সজল গুম মেরে গেল।

ডাক্তারি পড়ায় খরচ কত। সে গরিব বাবার ছেলে। তার পক্ষে ডাক্তারি পড়ার কথা ভাবাই কঠিন। অথচ কত সহজে কথাটা তাকে বলে দিলেন স্যার।

অবশ্য তার মার্কশিট দেখে কেমিস্ট্রির স্যার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, মুড অন মাই বয়।

বায়োলজির স্যার ডেকেও সাবাস দিয়েছেন।

ভাল কলেজ দেখে কেমিস্ট্রি কিংবা বায়োলজি নিয়ে অনার্স পড়ারও উপদেশ দিয়েছেন। এতটা পর্যন্ত ভাবা যায়। ডাক্তারি পড়বে সে, এ যে আকাশকুসুম।

সজল কেন যে এত ঘামছে। তার পরই দুম করে বলে দিল, স্যার চাকরি দরকার। পড়াশোনা আমার আর হবে না। আমি যাই।

আর তখন বড়দি ফিটফাট হয়ে আঁচল সামলে বসার সময় বললেন, কোথায় যাবে। বোসো। প্রায় ধমকের সুরেই যেন তাকে কথাটা বললেন।

বড়দির ব্যক্তিত্বের কাছে সে কেমন কেঁচো হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হল। ওঁার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

তার পরই সজলের ব্যাজার মুখ দেখে তিনি কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেন।

কেউ কথা বলছে না। পাঞ্জাবির হাতা সামান্য কুঁচকে গেছে, নীলাক্ষ তার পাঞ্জাবির হাতা সামান্য টেনে রুমালে মুখ মুছলেন। তার পর বললেন, আরে এ তো চাকরি চাকরি করছে। পড়াশোনা আর হবে না বলছে। তখন বড়দি বললেন, সজল মানুষের জীবনে সুযোগ এক বারই আসে, মনে রাখবে আমরা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, কিছু অসুবিধা থাকতেই পারে। ভর্তি হয়ে যাও, দেখবে সব অসুবিধা দূর হয়ে গেছে।

এবারে বড়দি যেন নড়েচড়ে বসলেন।

সজল সম্পর্কে তারা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে তো সজলের খুশি হওয়ারই কথা। সে এত মুখ ব্যাজার করে রেখেছে কেন। বাধ্য হয়ে বড়দি বললেন, কী হয়েছে?

ঝিনুর দিকে তাকিয়ে এমন প্রশ্ন করলেন। সজলকে প্রশ্ন করা যায় না, কারণ সে মাথা গোঁজ করে বসে আছে। মুখ তুলে বড়দিকে দেখছেও না।

ঝিনু বলল, ও পড়বে না। ওর চাকরির দরকার।

শোনো ঝিনু, এই বিদ্যায় চাকরি হয় না। হলেও কেরানিগিরি। মিনিমাম গ্র্যাজুয়েট না হলে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায়ও বসা যায় না। সজল কি তা জানে না। ওর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দেশের হালচাল কী, নিশ্চয়ই সে জানে।

তখনই সজল প্রায় মরিয়া হয়ে বলল, ডাক্তারি পড়ার এত খরচ কে জোগাবে বড়দি!

ভর্তি হয়ে যাও না, দেখ না কে জোগায়। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তার পরই তিনি বললেন, এটা সুবিধাবাদীদের এক ধরনের গুজব মনে রাখবে। ডাক্তারি পড়ার খরচ বলতে ভর্তি হবার সময় কিছু টাকা লাগে, সেটা খুব একটা আয়ত্তের বাইরে নয় তোমার। নীলাক্ষ না হয় আমি তোমাকে টাকাটা ধার দেব। পরে শোধ করে দেবে। কলেজের মাইনে কত বল তো?

আজ্ঞে জানি না।

মাত্র আট টাকা। বইয়ের অবশ্য দাম খুব। তবে পরিশ্রমী হলে কলেজ লাইব্রেরি থেকেই সব নোট করে নিতে পারবে। প্রথম বছরটা তো ডিসেকশন রুমেই কেটে যাবে। একটা স্কেলিটন দরকার হয়, বন্ধুদের কাছে পাবে, কিনে নিতেও পার, ভর্তি হলেই সব অলিগলি চেনা হয়ে যাবে। মাত্র একশ' কুড়ি টাকায় আমার এক ছাত্রী গত বছর স্কেলিটন জোগাড় করেছে। শরীরের সব ক'টা হাড়ই আছে, কিছুই মিসিং হয়নি। হাড় মিসিং না হলে পরের বছর একই টাকায় কঙ্কালটা বিক্রি করে দিতে পারবে।

সজলকে সাহস দেবার জন্য বললেন, আমি চিঠি দিয়ে দেব—আমার ডাক্তার ছাত্রী সুনন্দা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। ফাইনাল ইয়ার। ইচ্ছা করলে ফোনে কথা বলে নিতে পার, এস।

সজল বসেই থাকল। এতটা তার সহ্য হবার কথা না। সে খুবই কাতর হয়ে পড়ছে। আসলে ফোন সে জীবনে কোনও দিন কাউকে করেনি। তাও আবার একজন অনাত্মীয় মেয়েকে!

কী হল বসে থাকলে কেন?

না থাক বড়দি, পরে আলাপ করা যাবে।

নীলাক্ষই বললেন, সজল ছেলেমানুষ, ও ঘাবড়ে গেছে। এতটা সে আশা করেনি। তোর ছাত্রীর সঙ্গে পরে কথা বললেও চলবে। ডাক্তারি পড়তে শুরু করলেই ম্যাচিওরড হয়ে যাবে।

ঝিনু বলল, পরে কথা বললেও চলবে।

সজলের যেন গায়ের জ্বর সেরে গেল। বড়দি কিছুটা বিরক্ত, সজল এত ভিতু, না গ্রাম্য স্বভাবের জন্য এটা হয়েছে, এবং কৌতূহলবশতই যেন বলা, তোমার বেতড়ের বন্ধুরা দেখা করতে আসে না?

না।

মা-বাবাকে জানিয়েছ?

সে চুপ করে থাকল। বাবাকে জানালে ঠিক। কিন্তু বাবার কাছে, এটা যে সুসংবাদ নয়, বরং দুঃসংবাদই বলা যায়—কারণ টুপকার সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতায় আসাটাই বাবার পছন্দ ছিল না—সারাদিন গজ গজ করেছেন, পড়েটা কী যে হবে। সংসারে যা সাংঘাতিক অবস্থা, তুমি চললে কলকাতায়, ওটা তো ভাল জায়গা নয়। সেখানে গেলে কেউ ফিরে আসে না—এত করে বলছি, যাও উমানাথের কাছে, সে তো আমার গাঁয়ের মানুষ। বড় কংগ্রেস নেতা, তাকে ধরলে না, চললে কলকাতায়। তোমার গোঁয়ার্তুমির ফল কী হয় দেখো। আমরা তো তোমার কেউ না।

কী ছেলেরে বাবা! কোনও কথারই প্রায় উত্তর দেয় না! চুপ করে থাকে। বড়দি সজলের এই আচরণের কোনও ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না।

তোমার মা-বাবাকে জানিয়েছ, তুমি খুবই ভাল ভাবে পাশ করেছ।

জানিয়ে লাভ নেই, বলতে পারত, শুধু বলল, দেখি।

এটা যে বড় আত্মসম্মানের প্রশ্ন। সংসারের সব তো বলা যায় না। তার এই কৃতিত্বে বাবা যে খুশি হবেন না—বলি কী করে! বাবাকে সে কিছুতেই খাটো করতে পারে না, সে দরকারে ধূপবাতি বিক্রি করতে পারে, দরকারে মেসে রান্না করে উপার্জন করতে পারে, কিন্তু তার বাবার পক্ষে এই সব কাজ মেনে নেওয়া যে অসম্ভব। গোটা পরিবারের মান সম্মান বলে কথা।

সে জানে উদ্ধবদা দেশে গেলেও বলবে না, সজল মেসে রান্না করে উপার্জন করেছে। উদ্ধবদার সঙ্গেই তো সে বেতড় চলে এসেছিল। দেশ ছাড়া হয়ে যাওয়ায় কলোনির মানুষজনের মধ্যে সখ্যতারও শেষ ছিল না। সজল পড়াশোনায় ভাল, তার পড়া হবে না ভেবেই উদ্ধবদা তাকে বেতড়ে নিয়ে আসে। এবং দেশের বাড়িতে গেলে উদ্ধবদা তার সব খবরই দেবে, কিন্তু কখনওই বলবে না, সে পাচকের কাজ করে টাকা উপার্জন করেছে, সুবলে ব্যান্ডেজের কাপড় সে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, বলবে, তাঁতের কাজ, আর পাচকের কাজ—সম্মানের যে কত বড় হেরফের উদ্ধবদাও বোঝে।

সজলের আত্মসম্মান বোধ যে তীক্ষ্ণ। সে কী করে বলে, ভাল পাশের খবর পেলে বাবা খুশি হবে না। এমন বিপরীত কথা বড়দির পক্ষে সহ্য করাও কঠিন হবে। বাবার পক্ষেও অসম্মানের হবে। দেখি, ছাড়া বলার মতো আর কোনও কথা সে খুঁজে পায়নি।

দেখি মানে? বড়দি যেন কিছুটা রুষ্টই হয়ে উঠলেন। তোমার মা বাবা কত আশা করে আছেন—তোমার সজল কর্তব্যবোধ থাকবে না! টাকার জন্য দুশ্চিন্তা করবে না।

মুশকিল সে মামার বাসায় থাকার পর থেকেই আশ্চর্য এক রূপকথার জগতে জড়িয়ে পড়েছে। হাতের কাছে যা কাজ ঠিকই সে করে, তবে কর্তব্যবোধের দায় তার থাকে না—এক সময় লিখে জানালেই হবে। তার রোল নম্বর বাবার কাছে আছে, বাবা ঠিক খবর হয় তো জেনে গেছেন, কিন্তু এতে তো বাবার পেট ভরবে না, তাকে যে করেই হোক, বাবাকে কিছু টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ সে বুঝতে পারছে, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেই টিউশনের উপার্জন তার বেড়ে যাবে। এবং সে বুঝতে পারছে, এই উপার্জন বাড়লে, সে অনায়াসে বাবাকে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা পাঠাতে পারবে। এবং এই জন্যই মেডিক্যাল কলেজে তার ভর্তি হওয়া দরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তার গুরুত্ব বেড়ে যাবে ভেবেই সে রাজি হয়ে গেল—এবং বড়দির সঙ্গে অন্য সুরে কথা বলতে শুরু করে দিল—আমার বাবা তো রোল নম্বর জানে।

আরে তিনি জানেন, আর তোমার জানানো কি এক কথা!

এই নাও পোস্টকার্ড। লেখ চিঠি। ঠিকানা লিখে দাও। আমি ফেলে দেব। ডাকবাক্সে। তার পরই বড়দির উপদেশ, জীবন সম্পর্কে এতটা উদাসীন হলে কি চলে!

সজলের কাছে এটা মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি। তার এই ব্যক্তিগত জীবনে বড়দির নাক গলানো সে পছন্দ করছে না। কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না। মাথা গুঁজে চিঠিটি সে লিখল—পরম পূজনীয়, বাবা আমি এখন বেতড়ে থাকি না। চাউল পট্টি রোডে বড়মামার কাছে আছি। পরীক্ষার ফল মোটামুটি ভালই হয়েছে। আশা করি আগামী মাস থেকে আপনাকে বেশি টাকা পাঠাতে পারব। সুজন সৌরভের পড়াশোনার খরচ নিয়ে চিন্তা করবেন না। ঠিক চলে যাবে। 'অপর্ণা' লিখেই কেটে দিল। আসলে সে লিখতে চেয়েছিল অপর্ণার আর নতুন কোনও সম্বন্ধ এসেছে কি না।

আশ্চর্য বড়দি চিঠিটি পড়লেন না। সঙ্গেসঙ্গে কাজের মেয়েকে ডেকে ডাকবাক্সে চিঠিটি ফেলে দিতে বললেন।

কলকাতায় চলে আসার পর এটাই বাবা-মাকে তার প্রথম চিঠি—কারণ উদ্ধবদারা মাঝেমাঝেই দেশে অর্থাৎ নদিপুরের দুর্গানগরে যায়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দেশ ছাড়া হয়ে এরা যে একটি কলোনি পত্তন করে এবং সেখানে বাজার স্কুলও আছে। উদ্ধব, বদন, কার্তিক অর্থাৎ যারাই বেতড়ে

তাঁদের কাজ নিয়ে এসেছে, মাসে দু'মাসে তাদের যেতেই হয়। টাকাপয়সা দিতে যেতে হয়, অসুখে বিসুখেও যেতে হয়—যেতে হয় বলেই বাবা-মা ঠিক জানে সে বড়মামার কাছে বেলেঘাটায় থেকে বিপন কলেজে পড়াশোনা করছে। বড়মামার বাসায় মা এক বার নিজেও চলে এসেছিলেন। কয়েক দিন থেকেও গেছেন। তখন বড়মামা গোপাল বড় ভাল ছেলে সেজেছিল। নেশাভাঙ করত খালধারের গোবিন্দর ঝুপড়িতে। বাড়িতে নিপাট ভালমানুষ। মামিও ভালমন্দ খাওয়ার বন্দোবস্ত রেখেছিলেন। থাকতেও পীড়াপীড়ি করেন, তবে থাকেননি মা। বাড়িঘর ফেলে, এত বড় সংসার দেশে তাঁর পক্ষে থাকা যে সম্ভব নয়, কর্তাটি যে তার হিসেবি নয়, তা ছাড়া কালসর্প অপর্ণা কোথাও গেলে ফিরতে চায় না, শহরে ভাল সিনেমা শো থাকলে তো কথাই নেই। এত গোলমাল থাকলে সংসার ফেলে দূরে নিশ্চিন্তে রাত্রিবাস কত কঠিন। সারাটা দিন তার নিজের সংসারেরই কথা, পাটখেতে কারও গরু ঢুকে গেল কি না, গরুগুলোর ঠিক মতো জাবনা দেওয়া হচ্ছে কি না, ঠিক মতো গরুর দুধ দোওয়ানো যাচ্ছে কি না, বাছুরটা যা পাজি, সুযোগ পেলেই ছুটে গিয়ে বাট থেকে দুধ চুষে খায়, মামির সঙ্গে এই সব দুশ্চিন্তা নিয়েই তাঁর সব কথাবার্তা কিংবা দেশের আত্মীয়স্বজন আর কারা এল, অর্থাৎ সজল দেখেছে, মায়ের চিন্তা ভাবনায় তার কোনওই স্থান ছিল না। শুধু তার উপার্জন বাড়ছে কি না। সে চাকরির চেষ্টা করছে কি না এটাই মা'র একমাত্র চিন্তা ছিল।

আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে গেলে এই সব বড় শহরের খোঁজে এক দিন না এক দিন বের হয়ে পড়তেই হয়। অভাব অনটনে জেরবার হয়েই সজল উদ্ধবদাদাদের সঙ্গে বেতড়ে চলে এসেছিল, সেই উদ্ধবদাদা থেকে বিনয়মামার কথা ভাবলেও মনে হয় যোগাযোগই জীবনের আসল হেতু। বিনয়মামা না থাকলে বড়দিও জানতেন না, সে যথেষ্ট মনোযোগী ছাত্র, আর তার এখানে আসার পর জীবনের বড় ঐশ্বর্য মনোরমা। মনোরমাই তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে—এই স্বপ্নই তাকে দৌড় করাচ্ছে, জীবনের এক পাগল করা ঘোরের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে সে এটা আরও বেশি টের পেল। এখন সে বোঝে, মনোরমাই তাকে স্বপ্ন বিক্রি করেছিল। সামান্য পর্দা সরিয়ে আয়নায় প্রতিবিম্বে উলঙ্গ এক নারী, সমগ্র নারী, তার নাভিমূলে আশ্চর্য ঝাড় লণ্ঠনের বাহার এবং এই সে দিন সরোবরের ঢিবিতে যে-ভাবে তাকে তাড়া করেছিল, তার পর চোখে জল, সে এই শহর ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারে না।

এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে যাবার পরই সে যেন এক লাফে তার নিজের ম্যাচুরিটির খোঁজ পেল।

তাকে আর বড়দির ভাইঝি সুব্রতা কথায় কথায় ক্যাবলাকান্ত বলতে সাহস পায় না।

**তবু এক মুশকিল** থাকে—পরের বাড়িতে থাকার নানা অসুবিধাও থাকে, সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, কোনও কারণেই যেন বড়দি তার আচরণে আঘাত না পান, গেরস্থবাড়ির মানুষ মাত্রেই বিন্দুমাত্র অনিয়মে তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে, এবং এই সব কারণেই একটি আস্ত কঙ্কাল সংগ্রহের জন্য সে দৌড়ঝাঁপ করেছে ঠিকই, তবে খোঁজ পেলে কী হবে জানে না।

সুব্রতা জানতে পারলে যে রক্ষা থাকবে না, অশান্তি সৃষ্টি করবে, আর নীলাক্ষমামার স্ত্রীও ভাল চোখে দেখবে না, তিনি অন্তঃসত্ত্বা, গোটা বাড়ির মানুষজনই কঙ্কালের অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন, আসলে মানুষের অভ্যাস, রুচিবোধ—সেন হস্টেলে নির্মলের ঘরে বসে আছে, কারণ ঠিক হয়েছে, নির্মল তার সঙ্গে সোনারপুরে যাবে, একজন সিনিয়র খবর দিয়েছে এবং নির্মল খবরটা দিয়েছিল সজলকে, যদি নিতে হয় নিয়ে নে। দেরি করিস না। হাতছাড়া হয়ে গেলে সহজেই পাওয়া যাবে মনে করিস না।

নির্মলের বাড়ি জঙ্গিপুরে। আর তার বাড়ি নদিপুরে। মেডিক্যালে ভর্তি হবার পর, নির্মলই তার একমাত্র সহায়, সুবিধা অসুবিধায় সে নির্মলের পরামর্শ নেয়—কিন্তু তার অসুবিধের কথা কিছুতেই বলতে পারছে না।

কী হল, চুপচাপ বসে আছিস। যদি নিস তা হলে অমলদাকে বলি। তাকে কথা না দিলে, তিনি অন্য কাউকে বিক্রি করে দেবেন। ওর কাছে ভিসেরাও পাওয়া যাবে।

সবই বুঝলাম, বড়দি যদি অমত করেন।

অমতের কী আছে। তিনি তো স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, তাঁর তো না জানার কথা না। মেডিক্যালে ভর্তি হলে অ্যানাটমি বিষয়টা যে সব সময়ই গোলমেলে, অধিকাংশ ছাত্রই অ্যানাটমিতে ব্যাক পায়—

দেখ যাদের বাড়িতে থাকি, তারা সজ্জন, কিন্তু সংস্কার—

ও কিছু হবে না। নিয়ে নে, তোর তো আলাদা ঘর—বাইরের দিকে থাকিস। মেয়েটার কী নাম যেন।

সুব্রতা।

তোর ঘরে সে কি আসে?

তা অবশ্য আসে না। বাড়ির যে আমি গলগ্রহ সেটা ঠিক বোঝে। পড়াশোনা একদম করতে চায় না, ফাঁকিবাজ, যত জেদ, তত মেধা যদি থাকত ভাববার কারণ ছিল না।

বরং এক কাজ করি, সজল উদাস হয়ে কথাটা বলল।

কী কাজ?

না এইখানে, এটা এনে আপাতত তোর ঘরে যদি রেখে দি। নির্মল, তার কি কোনও অসুবিধে হবে?

কী হবে তাতে? আর যারা আছে, তাদেরও মত নেওয়া দরকার।

না ভাবছিলাম, পরে দু'টো একটা করে নিয়ে গেলে ধরাপড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

তোর কি মাথা খারাপ, সজল ?

কেন? মাথা খারাপের কী আছে?

যদি কেউ দেখে ফেলে হইচই হবে না! কীসের হাড় এ ঘরে সজল তোর হাড় আসে কী করে—বাড়ির কাজের মেয়ে সকালে ঘর ঝাঁট দেয়, জল দিয়ে মুছেও দেয়, ধরা তোকে পড়তেই হবে।

তা অবশ্য ঠিক।

তার চেয়ে পুরোটাই নিয়ে তোল। ধরা পড়লে বলবি, মেডিক্যালে মানুষের হাড় দিয়ে শুরু হয় বড়দি। ভিসেরা থেকে লিভার, প্লিহা, ফুসফুস তুলে নাম মুখস্থ করতে হয়। এক ফুসফুসের কত ভাগ, কত নাম। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না দেখলে কিছুই মনে থাকে না।

গন্ধ বের হবে!

ধুস, তুই কীরে।

যদি নতুন হাড়ফাড় হয়।

নতুন হলেই বা হবে কেন।

বোকার মতো কথা বলে সজলই কেমন ফাঁপরে পড়ে গেল। আসলে তারা গন্ধ পায় না, চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে তাদের কাছে ওটা হাড়ই হয়ে যায়। ফরমেলিনের গন্ধও পায় না, ভিসেরার সবটাই অর্থাৎ পেটের নাড়িভুঁড়ি, ফুসফুস, প্লিহা, লিভার, ফরমেলিনে ডোবানো থাকে। একটা টিনের ট্রে থাকে, গ্লাভস থাকে তারা গন্ধ পায় না, কিন্তু সুব্রতা যা নাকউঁচু মেয়ে, কী দুর্গন্ধ বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে তো ধরা পড়ে যাবেই। গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাদের নাক ভোতা ঠিক, তবে গেরস্থ বাড়ির মানুষজনের পক্ষে দুর্গন্ধ পাওয়া বিচিত্র নয়, তাই পচা লিভার, ফুসফুসের দুর্গন্ধ যতই ফরমেলিনে ডোবানো থাক, সুব্রতার নাকে ঝপাস করে গন্ধটা আচমকা ধাক্কা মারতেই পারে।

তুই বড় ভিতু সজল।

ভিতু না রে, পরের বাড়িতে থাকলে বুঝতে পারতিস।

আর সুব্রতার মতো বালিকার পাল্লায় পড়লে বুঝতে পারতিস।

তোর কাছে পড়ে বলেছিলি না! সে তো ছাত্রী।

ওই আর কী! বারান্দায় টেবিলে এসে বসে। অঙ্কের খাতাও দেয়। তবে সবই রাফখাতায় করে দিতে হয়।

তার পর তিনি কী করেন?

স্কুলের খাতায় সব টুকে নেয়। তবে মেয়েটার মুখস্থ করার অসীম ক্ষমতা। ঘ্যান ঘ্যান করে পড়ে, রাত জেগে পড়ে। অঙ্কও মুখস্থ করে। আমার মনে হয়, মুখস্থ বিদ্যাটি ও ভালই রপ্ত করেছে। বড়দি ধরতে পারে না। তা পাশ করে যাচ্ছে। বড়দি বোধহয় ওর মেধা কতটা মজবুত টের পেয়ে গেছেন, পড়ছে এই যথেষ্ট।

হুঁ।

নির্মল বলল, চা বলি!

চা!

এই নীলু, শোন তো, যা ক্যান্টিন থেকে দু' কাপ আমাদের জন্য চা নিয়ে আয়। দু' পিস মাখন টোস্ট, দু'টো ডিমের পোচ।

এত সকালে!

আগে খা। তার পর কথা হবে।

আর খাওয়া হলেই জামা গলিয়ে প্যান্ট পরে নির্মল বলল, চল।

কোথায়?

সোনারপুর।

অমলদা জানে।

জানে না। তবে গেলে ঠিক পাওয়া যাবে। কিছু না হোক বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে তো দেখা হবে।

তার চেয়ে কলেজেই দেখা করলে ভাল হয় না।

না, হয় না। কলেজে মেলা বান্দা, দেখা হলেই বলবে, দাদা, আপনার কঙ্কালটা কিন্তু আমি নেব। সোনারপুরে গেলে অমলদা বুঝবে, না এরা ঠিকই কিনবে, এতটা যখন ছুটে এসেছে—

কিন্তু টাকা পয়সা কিছু নেই আমার সঙ্গে।

ও ভাবতে হবে না। ওঠ তো। দাম যা লাগে দেওয়া যাবে। পরে শোধ করে দিবি।

নির্মলই একমাত্র বোঝে, এই কলকাতা শহরে সে সত্যি একজন বেচারা। নির্মল জোরজার করে নিয়ে না গেলে, আনাটমিতে কখনওই এত ভাল রেজাল্ট করতে পারত না। আর যে-দিন সে একটা বস্তা এবং ভিসেরার বালতি নিয়ে বড়দির বাসায় এসে হাজির হয়েছিল, সে যেন প্রকৃতই রাজ্য জয় করে ফিরেছে।

বিশেষ করে এক সন্ধ্যায় যখন সে বারান্দায় উঠেই বলেছিল, পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে। প্রায় যেন ইউরেকা—

সুব্রতা বারান্দায় দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিল, পাওয়া গেছে শুনেই দোলনা থেকে নেমে উজবুকটার ঘরে উঁকি দিতেই দেখল, সে শার্ট গেঞ্জি প্যান্ট খুলে শুধু জাঙ্গিয়া পরে বসে আছে।

আর মাঝে মাঝে কল থেকে জল নিয়ে মুখে ঝাপটা দিচ্ছে।

ঝাপটা দিচ্ছে, আর বলছে, যাক পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত।

সুব্রতা দরজার আড়াল থেকে লক্ষ করছিল—কারণ জাঙ্গিয়া পরে কোনও উম্মাদ বসে থাকলে ঘরে কিছুতেই ঢোকা যায় না। সভ্যতা ভব্যতার কোনও ধার ধারে না। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে, অবশ্য সেটা কী সে জানে না, পিসিও যেমন কোথাকার একটা গেঁয়ো ভূতকে শেষ পর্যন্ত তুলে আনল বাড়িতে। কাকা কাকিমার সবারই এক কথা, আরে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, সোজা কথা! অসুখ বিসুখে সাহায্য পাওয়া যাবে। তোর কোচিংয়ের কথাও ভাবা হচ্ছে। ছেলেটা খুবই সোজা সরল, অকপটও— ওকে দেখলেই পালাস কেন, ও কি তোর কোনও ক্ষতি করেছে।

আচ্ছা সহ্য হয়! একটা জংলিকে শেষ পর্যন্ত বাড়িতে তুলে আনলে।

কোথায় সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে নোংরা মাড়িয়ে এসেছে, তার পর যা গরম, এই গরমে সেদ্ধ হওয়াও যায়, তিনি যে এখন গামছা আর পাজামা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাবেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে—একটা কাঠ বাঙাল। আগে বাড়িতে এলে মাথা গোঁজ করে বসে থাকত। বড়পিসির সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ শুকিয়ে যেত, সেই এখন বাড়িতে নানা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে।

পিসি সকালেই দেখেছেন ঘর ফাঁকা। ঘরের দরজা খোলা, আরে কোথাও গেলে ঘরের শেকল তুলে যাবি না! সুব্রতা ওকে বলে দিস তো, ঘর থেকে বের হলে যেন শেকল তুলে দিয়ে যায়। কোথায় গেল বলে যাবে না!

সুব্রতা পিসির কথায় ভয়ঙ্কর বিরক্তিতে বলেছিল, আমার বয়ে গেছে বলতে, যাদের গরজ তারা বলবে।

এত সকালে না বলে না কয়ে গেল কোথায়! শত হলেও পরের ছেলে, কিছু হলে ওর বাবাকে কী জবাব দেব!

আমি তো পিসি জ্যোতিষী নই না, কোথায় গেল কী করে বলব!

পিসির মুখের ওপর এত বিরক্তি নিয়ে কথা বলার অভ্যাস তার নেই। কিন্তু এই সজলকুমার যা শুরু করেছে। কথা নেই বার্তা নেই এক সকালে কেন যে পিসি বলে দিলেন, সজল, তোমার খাওয়া থাকার অসুবিধা হবে না।

এ দিকটায় একটি শৌচাগার আছে। আগে বাড়ির মেয়েরা বাদে সবাই শৌচাগারটি ব্যবহার করত। এখন আর কেউ করে না। বলতে গেলে শৌচাগারটির দখলও সজলকুমার নিয়ে নিয়েছে।

শৌচাগারে সে যায়, তবে জামাকাপড় ছাড়ে না।

সে যায় তবে শুচিতার বালাই নেই।

গামছা পরে যাবার নিয়ম, এবং গায়ে জলটল ঢেলে বের হয়ে আসারও নিয়ম, কে কার নিয়মের তোয়াক্কা করে।

বাধ্য হয়ে পিসি তাকে এক দিন না বলেও পারেনি, তোমার এটা ঠিক না। শৌচাগারের বিধিনিষেধ নিয়ে মোটামুটি একটা ক্লাসও করিয়েছিলেন।

কী ঠিক না বড়দি!

জামাকাপড় পরে কেউ বাথরুমে ঢোকে। সেই জামাকাপড় পরে কেউ চৌকিতে এসে বসে। জামাকাপড় ছেড়ে ঢুকতে হয়। তোমার গামছা নেই?

আজ্ঞে আছে।

আছে যখন ব্যবহার করলে ক্ষতি কী!

ক্ষতি কিছু না।

কর না কেন?

করব।

বড়দি খুশি, বলেছে করবে। তুই আর সুব্রতা পেছনে লাগিস না। সামনে তোর পরীক্ষা, অঙ্কে তুই কাঁচা, জানিস তো, স্কুল ফাইনালে অঙ্কে সজল একশোতে একশো পেয়েছে। তোর পরীক্ষার কথা ভেবেই ওকে থাকতে বলেছি।

সেও চেঁচিয়ে বলেছিল, ভারী উদ্ধার করেছ।

শোন সুব্রতা, তোর জন্যই ওকে রাখা। ও তোর গৃহশিক্ষক। ওর পেছনে লেগে থাকা ভাল, তবে বেশি লেগে থাকা বোধহয় ভাল না। ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে তুই রেগে যাস কেন। ও তো কোথা থেকে ডালও কেটে আনে।

সজল সরু সরু নরম কীসের ডাল এগুলো?

নিমের ডাল। দাঁত মাজার বিষয়ে বড় উপকারী বস্তু। দাঁতে কখনও পোকা ধরে না।

ঘুঁটের ছাই থেকে উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত নিমের ডালে তোলা গেছে।

কিন্তু সুব্রতার পছন্দ না। পিসিকে বলেছে, ব্রাশে দাঁত মাজতে বলবে, না মাজলে ওর কাছে আমি পড়ব না। টিউশনি করে উপায়ও তার মন্দ না, তা ছাড়া কী একটা স্কলারশিপও পায়।

গরম পড়েছে খুবই। দুপুরের রোদে লু বইছে। এক দিন সজল চানটান করে খালি গায়ে জানালার পাশে বসে গ্রেসের অ্যানাটমি বইটির পাতা উল্টে ছবি দেখছিল। শরীরে দু'শো ছটি হাড়, বইজুড়ে হাড়, বলতে গেলে বডি কাটা-ছেঁড়া করলে কী কী উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়, তার বর্ণনা-সহ ছবি এবং বিস্তারিত ইতিহাস আছে এই বইতে। প্রথম বছরটা তার ডিসেকশন রুমেই কেটে যাবে— বইটির অধীত বিদ্যার বহর যার যত বেশি, তার পাশের হারও তত বেশি। নতুন এডিশনের বই কেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে পুরনো এডিশনের একটি বই ক্রয় করেছে, এবং ঠিক হয়েছে কিস্তিতে টাকা শোধ করবে। শরীরের এমন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বইটিতে আছে বলেই সুযোগ পেলেই বইটি নিয়ে তক্তপোষে উবু হয়ে পড়ে থাকে। ফেল করা ছাত্রদের অধিকাংশই অ্যানাটমির। অ্যানাটমির ভূত তাকে এখন বোধ হয় তাড়া করছে।

সুব্রতা এক পড়ার সময় ছাড়া কিংবা অতি দরকার ছাড়া এই উজবুক যুবকের ঘরে ঢোকে না। পুরুষমানুষের খালি গায়ে থাকা যে অসভ্যতা, সেটা তার ধারণার মধ্যেই নেই।

এই কী রে বলেই প্রায় জিভ কেটে বের হয়ে গেছিল সুব্রতা।

পিসিকে স্কুল থেকে ফেরার পরই বলেছে, না চলবে না। এটাকে তাড়াও। অঙ্কে একশো পেয়েছে তাই না! আমার হাতে পড়লে শূন্যও দিতাম না।

কী হয়েছে বলবি তো!

কী আর হবে! ঘরের মেঝেতে চটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলেজ থেকে ফিরে চানটানও করে না। হাতে পায়ে সাবান দেয় দেয় কি না কে জানে। নানা ব্যাধি ঘেঁটে মানুষ কখনও এতটা নির্বিকার থাকতে পারে। আমি জানি না বাপু। নির্ঘাত মাথা খারাপ আছে। চটি পায়ে ঘরে বারান্দায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।

সজল বিকালের দিকে বের হবে ভাবছিল, এখানে উঠে আসার পর মনোরমার সঙ্গে আর রোজ কথা হয় না, দেখাও হয় না। মনোরমার কথা মনে হলেই সে কিছুটা কেমন উৎপিপাসু হয়ে যায়। বড় আকুল হয়ে ওঠে। তাকে দেখলেই মনোরমা দূর থেকেই চেঁচাবে, ডাগদারবাবু আসছে—বাড়ির সবাই বারান্দায় হাজির হয়। তার পর মনোরমার ঘরেও সে ঢুকে যায়। এখন আর মনোরমা ঘাঘরা পরে না, শাড়ি পরে একেবারে বাঙালি ললনা। তার বাবুজির আসার কথা আছে। এই সব চিন্তায় সে কিছুটা অন্যমনস্ক। চটি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দায় খেয়ালই ছিল না। সুব্রতা চেঁচাচ্ছে এই মেনকাদি শিগগির এস, বারান্দা মুছে দাও। বারান্দাটা কী করে রেখেছে দ্যাখ!

সঙ্গেসঙ্গে দু' লাফে অনতিক্রম্য বারান্দা কোনও রকমে পার হয়ে ঘরে ঢুকে যায় সজল। এই ঘরটিতে ঢুকে গেলেই তার নিষ্কৃতি। বারান্দার এ দিকটায় একটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘর তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এতেই যারপরনাই সে খুশি। সেই পাতি তক্তপোষের প্রায় দ্বিগুণ একটি তক্তপোষ পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য, যে পায় সেই জানে, শুধু এই ছাত্রীটির অবাঞ্ছিত তাড়ার মধ্যে না থাকলে প্রায় রাজসুখেই থাকার কথা।

কাজেই ছাত্রীটির পরবর্তী স্টেপ কী হবে সে জানে না। কারণ মেনকাদির

কাজই হচ্ছে সারাক্ষণ বাড়ির লাল মেঝে মুছে ঝকঝকে করে রাখা।

লাল মেঝে বিন্দুমাত্র ময়লা সইতে পারে না।

বাথরুম থেকে জলপায়ে হেঁটে এলে সকাল দেখে থাকে কিছু ক্ষণের মধ্যে পায়ের ছাপ ফুটে বের হচ্ছে। বিকেল বেলায় এই বারান্দার একচ্ছত্র অধিপতি এই বালিকা। দোলায় বসে কেবল দোল খায়।

বালিকা না কচু! আর এত খিটকেল কে সহ্য করে।

ডাঁসা পেয়ারাও বলা যেতে পারে। স্তন যথেষ্ট ভারী হয়ে গেছে। বুকজুড়েই ফ্রক পরে থাকে। নাবালিকা সেজে থাকে। কিংবা উরুদেশ ভারী এবং মনোরম সবুজ হয়ে আছে মনে মনে সে ভালই টের পায়। আরে নাবালিকা সেজে থাকলেই কি সাজা যায়। নারীর শরীরে গভীরতায় মাপ তার জানা নেই, তবে মনোরমা বাড়ি, বাড়ি না সে তখন মানসিক অবসাদে ভুগছিল এবং সে যে এখনও সেই অবসাদ থেকে মুক্ত আছে বলা মুশকিল।

তবে মনোরমার আচরণে আবেগের ভঙ্গিমা বিন্দুমাত্র নেই, সে তাকে একা পেলেও তার পুরুষাঙ্গে আর হাত দেয় না। মনোরমা নিজের উরু সন্ধিস্থলে খাবলা তুলে তার যোনির সন্ধান নিতেও বলে না সজলকুমারকে। সেই থেকে দুর্গাপ্রসাদ কিংবা হুকুম সিংও লক্ষ করে থাকতে পারে দিদিমণি কিংবা মাইজি যথেষ্ট শান্ত, কথায় কথায় কোথাও পালাতে চায় না, এবং মনোরমা ডাক্তারবাবুর অপেক্ষায় থাকে, তাও তারা বুঝে গেছে। একজন হবু চিকিৎসক মেয়েটির যদি ভার নেয় তবে দুর্গাপ্রসাদ কিংবা মদন পাণ্ডের দুশ্চিন্তা দমন হতে পারে—এবং মনোরমাই ছিল সে দিনকার আততায়ী, তাঁর কথা না ভাবলে, বারান্দায় পায়ের ছাপ ফেলে ঘরে ঢোকার বিন্দুমাত্র দ্বিধা চিন্তা তাকে আক্রান্ত করত না। ঘরে ঢুকেই টের পেয়েছিল তিনি আসছেন— রাজবালার রোষ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য সে তাড়াতাড়ি কিছু না পেয়ে নিজের খোলা গেঞ্জি দিয়েই দ্রুত বারান্দাটি মুছে দিয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাওয়ায় কেলেঙ্কারির শেষ ছিল না।

এটা কী করছেন! বারান্দা কে মুছতে বলল? বাড়িতে কি লোক নেই?

সুরতা, তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে, মোছা ভাল হয়নি।

জলের ন্যাতা পেলেন কোথা থেকে। মেনকাদি জানতে পারলে বাড়ি মাথায় করবে। মেনকাদি তার ন্যাতা কাউকে ধরতে দেয় না। আপনার তো সাহস কম না।

না, না, আমি মেনকাদির ন্যাতা ধরতে যাব কেন। দেখ না। দেখলেই বুঝতে পারবে। ওকে আর ডাকাডাকি করা ঠিক হবে না।

ও মা, প্রায় দু' হাতে বিস্ময়ে সুরতা মুখ আড়াল করে চেঁচাল, কাকি দেখ এসে যাও।

সুখের দিবানিদ্রা ভেঙে গেলে কার রাগ হয় না।

সুরতা চেঁচাচ্ছিস কেন?

এস না, দেখবে।

আমি পারব না। দিদি তো ঘুমটা ভাঙিয়ে।

এত চেষ্টা করে মুখ আড়াল করা সত্ত্বেও হাসি চাপতে পারছিল না সুরতা, হা হা করে হেসে উঠেছিল, এবং হাতের ন্যাতাটি পায়ে চেপে বসেছিল, সজল। সজল উবু হয়ে বসেছিল, হাতের ন্যাতা ছেড়ে দিলে রাজবালা যদি তুষ্ট হন, এবং তুষ্ট বিধানেই কাজটি করা।

সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

শরীরে লম্বা ফ্রক কিংবা ম্যাক্সিও বলা যায়, উবু হয়ে, মরা ইঁদুর কিংবা বেড়ালছানার মতো তুলতে গেলে, সকলের যে কী হয়। একজন কিশোরী ম্যাক্সি পরলে এবং যদি অন্তর্বাস না থাকে, পেছন থেকে ম্যাকসি তুলে ফেললে পাছার দৃশ্যটি কেমন না জানি দেখায়।

সজলের এই ধরনের কিছু ভ্রম তৈরি হয়। সুন্দরী ডবকা কিশোরী হলে তো কথাই নেই। তার কুচিন্তা বাড়ে।

সুরতা ন্যাতাটি পাঁচিলের ও পাশে ছুড়ে ফেলতে গেলে চোখ থেকে সেই মনোরম কুচিন্তার দৃশ্য উবাও।

আরে করছ কী! ফেলবে না। আমার নতুন গেঞ্জি, বলেই ছিনিয়ে নিতে গেলে, সুরতা গেঞ্জিটা নাকের উপর দোলাতে থাকল।

ক্ষমতা থাকে নিন, সুরতা দোলাচ্ছে আর বলছে, একশ' পেয়েছে, একশ' না কচু পেয়েছে, কাণ্ডজ্ঞান না হলে মেসে রান্না করতে হয়। আপনাকে কে বলেছিল বারান্দা মুছতে, মেনকাদি আছে কী করতে! দিদি জানতে পারলে কত রাগ করবে বলুন—মিষ্টি হাসি হেসে কত সহজে তার নতুন গেঞ্জিটি পাঁচিল টপকে জোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল—তার রাগ হয় না।

তার যত রাগ হয়, মাথায় কুচিন্তা তত বাড়ে। কুচিন্তা করতে তার ভাল লাগে না, নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতে হয়। শত হলেও সুরতা তার ছাত্রী, কল্পনায় ভাবলেই বেশি সুন্দর দৃশ্য তৈরি হয়, তবে সে দেখেছে, অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী নারীরা তার কুচিন্তা থেকে রেহাই পায় না। বিশেষ করে মাথা ফাঁকা থাকলে এটা তার বেশি হয়। আর মনোরমা কিংবা রুমালি যে নামেই ডাকা যাক না, প্রহ্লাদের অন্ধকারে কোনও নারীর তার পুরুষাঙ্গটির লালসায় থাওয়া এবং ক্ষণকালের জন্য ধামসানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এই সব কুচিন্তার উদ্ভব। শরীর গরম হলে নারী পুরুষ উভয়েই কতটা অশ্লীল হতে পারে কারণ—রুমালি তার শিক্ষণীয় বিষয়। আর সেই রুমালি যখন পবিত্র নারী হয়ে বসে থাকে পুজার ঘরে তখনই যে সে মনোরমার এই বোধোদয় থেকেই সুরতাকে পুজার ঘরের লক্ষ্মীরূপা জননীসমা ভাবার চেষ্টা করে। কিছুটা শান্ত হলেও ক্ষোভ তার নমনীয় হয় না।

তুমি আমার নতুন গেঞ্জিটা ফেলে দিলে সুরতা! তোমার শরীরে দয়া মায়া নেই। গরিব বাবার ছেলে হলে বুঝতে—অবশ্য নিজের এই ঘরটিতে বসে সবই ভাবা যায়।

সে দিন সন্ধ্যায় তার ঘরে বড়দি হাজির। সাধারণত তার ঘরে তিনি পা দেন না। আচার নিয়মের বালাই নেই ছেলেটার। বাইরে থেকে এসে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলতে হয়। জামাকাপড় বাইরের ইনফেকশান ক্যারি করে, হাসপাতালের যত জীবাণু জামা প্যান্টে যে মাখামাখি হয়, তা ছাড়া জাত বেজাতের ছোঁয়াছুঁয়িও বড় কারণ। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে যেমনটা হয়ে থাকে আর কী।

আলো জ্বালোনি কেন? অন্ধকারে কী করছ!

সজল ধড়ফড় করে উঠে বসল। বড়দি এখন তার সামনে ফারাও সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার মতো যেন দাঁড়িয়ে আছেন। সত্যি অন্ধকারে বড়দির মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার নতুন গেঞ্জিটার শোকে সে কিছু ক্ষণ চোখের জল ফেলেছিল, তার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন, বড়দি ডেকে না দিলে কী হত জানে না। কারণ আর কিছু ক্ষণ পরেই সুরতার বইটই বুকে নিয়ে বারান্দায় ঢোকার কথা—সে ঘুমিয়ে থাকলে মেয়েটা কেন যে খেপে যায় বোঝে না। বড়দি তাকে প্রথমে বললেন, ওঠো, আলো জ্বেলে দাও।

দেয়ালের সুইচ বড়দির হাতের কাছে। বড়দি নিজেই আলোটা জ্বেলে দিতে পারতেন, দেওয়া বোধহয় উচিত হবে না— সুতরাং সে উঠে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দাঁড়িয়ে থাকল। কারণ বড়দি তার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন, সে বসে কী করে!

কখন ফিরলে হাসপাতাল থেকে।

আজ হাসপাতালে যাইনি বড়দি।

যাওনি কেন।

সে বলল, ক্লাস শুরু হয়নি বড়দি। সিনিয়ররা টেনে নিয়ে যায়— তার পর যে অকথ্য গুলতানি শুরু হয়, সেই গুলতানিতে যোগ না দিতে পারলে, যা চা নিয়ে আয়। পয়সা! পকেট কি গড়ের মাঠ! যা নিয়ে আয়, কখন কী শাস্তি হবে, এই আতঙ্কেই ভেবেছিল, ক্লাস শুরু না হলে হাসপাতাল যাবে না। তবে যায়, আউটডোরের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকে। কখনও সারা হাসপাতালের এ ঘরে সে ঘরে উঁকি মারে, তার পর কিছুটা বেলা পড়লে বেলেঘাটার বাসে সে উঠে পড়ে। আজ অবশ্য সে তার বন্ধু নির্মলকে নিয়ে সোনারপুরে গিয়েছিল।

বারান্দা মোছা তোমার কাজ?

আজ্ঞে না।

তবে ন্যাতা মারছিলে কেন?

আজ্ঞে আমার জুতোর ছাপটাপ পড়েছিল— বিশ্রী লাগছিল দেখতে।

তাই বলে নিজের গেঞ্জি দিয়ে!

সে বলতে পারত, আজ্ঞে বড়দি বাড়িটায় বড় আতঙ্ক। কখন কী যে পান থেকে চুন খসবে, অবশ্য সে কিছুই বলল না। ভ্যাব ভ্যাব করে চেয়ে থাকল।

শোনো, সুরতাকে আসকারা দেবে না।

তা দিই!

বাড়িতে কাজের লোকেরা কী করতে আছে!

তাই তো।

জুতো সিঁড়ির নীচে রেখে আসবে।

আচ্ছা।

হাসপাতাল থেকে ফিরে জামাকাপড় ডেটলে ডুবিয়ে দেবে।

ডেটল!

হ্যাঁ ডেটল। মেনকাকে বলে দেব। সে ধুয়ে ছাদে মেলে দেবে। বাড়িতে খালি গায়ে ঘোরাঘুরি করবে না। খালি গায়ে থাকটা অসভ্যতা। মেনকাকে বলে দেব, সপ্তাহে এক দিন অন্তত তোমার বিছানার চাদর ওয়াড় কেচে দিতে।

না, না, আপনি বলবেন না। জামা প্যান্ট ধুয়ে নিতে পারব। মেনকাদি এমনিতেই সময় পায় না। কিন্তু—

কিন্তু আবার কী!

আমার বাবা যে, বাড়িতে জামা গায়ে দিয়ে থাকলে রাগ করেন। —অসুখবিসুখ না হলে বাড়িতে কে জামা গায়ে দেয়। তুমি জামা গায়ে ঘুরছ কেন। দেখি তোমার হাত— নাড়ি টিপে কিছুটা হালকা হলেই বলতেন, খোলো জামা। গায়ে হাওয়া লাগাও। এতে শরীরের উপকার জানো।

বড়দি জানেন, এ সব প্রাচীন কথাবার্তা, তবে তিনি তো তার বাবাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারেন না। —বুঝলে সজল, ওরা আগেকার আমলের মানুষ। আর মনে রাখবে নিজের বাড়িতে এক রকম, হ্যাঁ বলছিলাম, হাসপাতাল যাওনি তো, কোথায় গেছিলে। সারা দিন পাত্তা নেই। কোথায় ছিলে। কোথাও যাবার থাকলে বলে যাবে কাউকে।

সজলের কেন জানি মনে হল, বড়দির কথায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। বড়দির কথা সে খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনে।

গেছিলে কোথায়। দরজা খোলা, সকাল থেকেই না কি দরজা খোলা, কোথাও বের হলে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে যাবে।

আচ্ছা।

সারা দিন কাটালে কোথায়? খেয়ে বের হয়েছিলে?

আজ্ঞে না।

খেয়েছ কোথাও?

আজ্ঞে না।

সে যে সোনারপুরে গিয়েছিল এক সিনিয়র ছাত্রের কাছে। না গেলে কঙ্কাল ভিসেরা হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে বলে যাওয়া উচিত ছিল। সোনারপুর বেশি দূরে না, ট্রেনের গণ্ডগোলে, তার পর সিনিয়র ছাত্রটি বাড়ি না থাকায় তাকে এবং নির্মলকে বেশ অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। নির্মলের সঙ্গে অবশ্য বন্ধুত্ব হবার কারণ, সে জঙ্গিপুরের ছেলে। মেন হস্টেলে সিট পেয়ে যাওয়ায় তারও সম্প্রতি সুবিধা হয়েছে। ক্লাস না থাকলে নির্মলের ঘরে শুয়ে থাকে এবং বিড়ি খায়। নির্মলই ওকে বিড়ি খাওয়া শিখিয়েছে, এ-জন্য দু'জনেই এখন বেশ ঘনিষ্ঠতা অনুভব করে।

নির্মল ভিসেরার বালতিটা নামানোর সময় সুব্রতাকে দোলনায় দেখেছিল। সজলও দেখেছিল, মেয়েটির উৎপাতের ভয়েই নির্মলকে ছেড়ে দিয়ে একাই ভিসেরার বালতি, আর কঙ্কালের ব্যাগ কাঁধে করে ঘরে ঢোকার মুখেই, যেমন উৎপাতের ধন যায় চিতপাতে, তাকনাটা মাথায় কাজ করার সময়ই চেঁচিয়ে উঠেছিল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। অবশ্য সুব্রতা পিছন ফিরে দোল খাচ্ছিল। সে ঘরে ঢুকেই কঙ্কালের বান্ডিল আর ভিসেরার বালতি তক্তপোষের নীচে দ্রুত ঢুকিয়ে দিয়েই গলদঘর্ম, ফলে জামা প্যান্ট খুলে শরীরকে হাওয়া খাওয়াবার চেষ্টা, সুব্রতা দেখতেই পায়নি। উজবুকটা গন্ধমাদন নিয়ে বাড়িতে হাজির। বালতিটা কী ভারী! একগাদা নাড়িভুঁড়ি, লিভার, ফুসফুস, প্লিহা ফরমেলিনে ডোবানো, ভারী তো হবেই, সুব্রতা দেখতে পেলেই কেলেঙ্কারির একশেষ। সে নীচে নেমে গেট থেকেই বলেছিল, তুই শিগগির চলে যা নির্মল। এবং সে সন্তর্পণে গেট খুলে, সুব্রতার আড়ালে সব নিয়ে ঘরে ঢুকে গেছিল। এবং নির্মল চলে গেলে একেবারে রাজকীয় কায়দায় পেয়েছি, পেয়েছি। তখনই সুব্রতা উজবুকটার পেয়েছি কথাটায় দোলাদুলি থামিয়ে দিয়েছিল। তত ক্ষণে সে তার ঘরে।

বড়দির যা হয়, পড়াশোনায় এত ভাল, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি এত কম হয় কী করে! তার কথার কোনও জবাবই দিচ্ছে না।

কোথায় ছিলে?

সোনারপুরে গিয়েছিলাম।

সোনারপুর চিনে যেতে পেরেছ একা?

নির্মল সঙ্গে ছিল।

নির্মল কে?

ফার্স্ট ইয়ার এমবিবিএস-এর ছাত্র। আমার সঙ্গে পড়ে। আমাদের দেশেই বাড়ি। জঙ্গিপুরের নাম শুনেছেন? জঙ্গিপুরে দাদাঠাকুরের বাড়ি যেখানে?

দাদাঠাকুরকে তুমি দেখেছ?

খুব। বাবার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা। মাঝেমাঝে কলকাতায়ও দাদাঠাকুর আসেন।

হঠাৎ সোনারপুরে?

না মানে। খবরটি যে সুবিধের হবে না বুঝেই বলল, পুরনো বইয়ের খোঁজে। ডাহা মিথ্যে কথা বলে আত্মতুষ্টি তার একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকাশ পেল।

মাঝেমাঝেই তার চোখ চৌকির নিচু অংশে ক্ষীণ আশার বুদবুদিতে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ঝুড়ির আংশিক কিংবা বালতির আংশিক না আবার বের হয়ে থাকে, বড়দির দৃষ্টিগোচর হয়। পারিবারিক বেড়াজাল এত! হাসপাতাল থেকে ফিরে সোজাসুজি বড়দি যা বললেন, স্নানটান সেরে ঘরে ঢুকতে হবে।

বালতির ঢাকনাটা আংশিক ফাটা। অনেক হাত ফেরতা হলে যা হয়। প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও হাত ফেরতা হয়ে কঙ্কালটিকে ঘুরতে হয়। কলকাতার অনেক জায়গাই তাঁর চেনা, প্রথমত সে কঙ্কালটির সব ক'টি হাড়ই গুনে হিসেব করে বস্তাবন্দি করেছে। সব ক'টি হাড় আছে, এমন কঙ্কাল সহজে মেলে না। হাতের হাড় পাওয়া গেল—সোনাগুনতি শেষ, দেখা গেল কড়ে আঙুলের মাথার হাড়টি নেই। মোটামুটি তার ক্লাস করার মতো বই এবং হাড় জুটে যাওয়ায় আহ্লাদে টগবগ করে ফুটছিল, এবং মিছে কথা বলে বড়দিকে ফুটিয়েও দিতে পেরেছে। বড়দি যে খুবই সদাশয়, না হলে কী দরকার ছিল একজন ধূপবাতির বেচুকে একেবারে ঘরে তুলে আনার! কিরণমামা মাঝে এক দিন এসে খোঁজও নিয়ে গেছেন— তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না। এরেই কয় মানুষের কপাল— তা না হলে উদ্ভব দাশেরই বা কী দরকার ছিল, ব্যাণ্ডেজের কাপড় বেচার জন্য তাকে নিয়ে আসার বেহুড়ে। তার পর মামার সঙ্গে হাওড়ার সেতুতে দেখা হয়ে যাওয়া, তার পর কচুরিপানায় ঠাসা একটি জলা বস্তিতে ওঠে আসা, কিরণমামার সঙ্গে ধূপবাতি বিক্রি করতে বের হয়ে বড়দির সাক্ষাৎ পাওয়া, কপাল, কপাল।

আসল সমস্যা হল ফরমেলিনের গন্ধ। ফরমেলিনের গন্ধ, না ভয়ের গন্ধ। ফাটা ঢাকনা দিয়ে গন্ধ যে চোঁয়াচ্ছে সে তাও টের পেয়েছিল।

ঘরে এমন চামসে গন্ধ কেন রে, প্রশ্ন করলেই সে খখাত সলিলে। সে তাই ভেবে রেখেছে, গভীর রাতে কঙ্কালের হাড়গোড় বের করে তার অধ্যয়ন পর্বটি সারবে। তখন সে একাই থাকে। দরজা বন্ধ করলে শুনশান হয়ে যায়, পাঁচিলের পাশের বাড়িটা গাছপালায় ঢাকা, এবং এই বাড়ির চার পাশেও আম, জাম, নারকেল গাছের ছড়াছড়ি, জানালা খোলা থাকলে মোটামুটি ফরমেলিনের গন্ধ গাছপালার ডালপাতা শুষে নেবে, আর শেকল তোলার কথা যখন আছে, কোথাও বের হলে দরজার শেকল তুলে বের হওয়া উচিত, তখন সে শেকল তো তুলে দেবেই, এবং একটি তালাচাবিরও ব্যবস্থা রাখবে। তার সম্পর্কে বড়দি, মামিমা এবং নীলাক্ষমামার বিশেষ কোনও কৌতূহল নেই। তাদের এক কথা, তুমি গরিব বাবার ছেলে, মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছ, মাথাটি যেন বিগড়ে না যায়। ক্লাস কামাই করবে না, সিনিয়রদের কথা শুনবে— আর নেশা থেকে দূরে থাকবে— বিড়ি সিগারেট না খেলে ভাল হয়।

অবশ্য বিড়ি খাওয়াটা দোষের মনে করে না। তবে বাড়িতে কখনও খায় না।

নতুন ক্লাসে নতুন বই-এর মতো কঙ্কালটার প্রতি কৌতূহল সজলের। অ্যানাটমির বই-এর ছবির সঙ্গে নাম মিলিয়ে সাজিয়ে পুরো কঙ্কালটা না দেখা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না। দরজা বন্ধ। রাতে সবাই একসঙ্গে এক টেবিলে খায়, মামি কখনও মেনকা দরজায় কড়া নাড়বে। খাবার দেওয়া হয়েছে। ঠিক দশটায়ই সবাই খেতে বসে। সে, বড়দি, বড়দির বাবা নিশিনাথ, সুব্রতা। সুব্রতা কখনওই তার দিকে তাকায় না। কেন যে এত রাগ তার, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন কোনও রকমে গলাধঃকরণ— মেডিক্যালে পড়ে বলে সবার একেবারে মাথা কিনে নিয়েছে! বড়দি সাধারণত খাওয়ার টেবিলেই জেনে নেন, সে ক'টায় বের হবে, ক'টায় ক্লাস, ডিসেকশন শুরু হবে আগামী সপ্তাহ থেকে?

সজল চোখ তুলে তাকালে বড়দি বললেন, তোমার ভয় হয় না।

কীসের ভয়?

ছেলেমানুষ তুমি।

মেডিক্যালে পড়ি, ছেলেমানুষ ভাবছেন কেন।

শব হলেও একটা মরা মানুষের শরীর—

সুব্রতা সঙ্গেসঙ্গে ওক করে বমি করে দিল পাতে।

মেসোমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, মিনতি আর সময় পেলে না। দেখলে তো, নাও এ বার সামলাও।

কিছু হবে না বাবা! জীবন কী বুঝতে শিখবে না।

যাই হোক, বড়দি আর হাসপাতাল সংক্রান্ত কোনওই কথা বললেন না। কেবল সুব্রতার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন।

বেশি বেশি!

মেসোমশাইরও পছন্দ নয়, খেতে বসে মানুষের শেষ পরিণতি নিয়ে মিনতি কথাবার্তা বলুক।

সজল কিন্তু মজাই পায়। সুব্রতা হাতমুখ ধুয়ে তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে হেঁটে গেল। মেয়েটা কি বাকিটা এ বার বাথরুমে উগরে দেবে। কিছুটা যেন সে শঙ্কিত হয়ে উঠল। এরা কেউ তো জানে না। ইতিমধ্যে বেওয়ারিশ একটা কঙ্কাল ঘাপটি মেরে এই বাড়ির তক্তপোষের নীচে পড়ে আছে! তার পর কেন যে মনে হল, বড়দিকে না বলে কঙ্কালটা নিয়ে আসাও বোধহয় ঠিক হল না।

তবে এ বাড়িতে সবার শেষে ফেরে নীলাক্ষমামা। কাগজের অফিসে কাজ। বারোটা বেজে যায়। মেনকাই জেগে থাকে। মামিও থাকেন। হট পটে

তার খাবার টেবিলে সাজানো থাকে। খেয়ে শুতে শুতে তাঁর প্রায় একটা বাজে। ওঠেন বেলা করে, আটটার আগে বিছানা ছাড়েন না।

খাওয়ার পর বারান্দার সোফায় সজল কিছু ক্ষণ বসে থাকে। গ্রীষ্মকাল, তবে বাড়িটার চার পাশে গাছপালা আছে বলে বেশ হাওয়া আছে। কিছুটা শরীর জুড়িয়ে নেবার মতো। মনোরমার কথা মনে হলেই তার মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। শাশ্বত নারীর মতোই সে যেন যৌনতা শৃঙ্গার— অশ্লেষ পুলকের উন্মেষ, উদ্দাম, উন্মীলিত যুবতী, ছুঁলেই সে শ্বেতাম্বরের তারের মতো বেজে ওঠে— মেয়েটা কেমন অপরাধবোধহীন দৃপ্ত নারী। শরীর চায়, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঝড় উঠে গেলে তার দোষ কী। পার্থিব জৈবিক আকাঙ্ক্ষা তার তীব্র। এমন একটা মেয়েকে শেষ পর্যন্ত সে পোষ মানিয়ে ফেলেছে।

সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলে, না, তুমি বাধা দিলে কী হবে! আমি আমার মরদের একশ' একুশটা বাচ্চা পেটে ধরব। বছর বছর জোড়ায় জোড়ায় কি তারও বেশি আমার সন্তান ধারণের ইচ্ছে।

পাগলের মতো বকো না।

বাৎস্যায়ন ছাড়াও কামকলায় দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে আমাদের দেশে, তুমি জানো, গান্ধারী থেকে এমন অনেক ঐতিহাসিক নারী আছেন আমাদের পুরাণে, মহাকাব্যে।

মেয়েটার কথা কেন জানি তার চুপচাপ ভাবতে ভাল লাগে। মনোরমা কোনও জিপসি মেয়ের গর্ভে মদন পাণ্ডের ঔরসজাত সন্তান— এমন গুজব সে কুঠি বাড়িতে কান পাতলে যেন শুনতে পায়। জিপসিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোনওই ধারণা নেই তার। জনপদ সংলগ্ন কোনও ফাঁকা মাঠে জিপসিরা তাঁবু ফেলে। হয়তো সুদূরে ছিল সেখানে কিছু গাছপালা, মাঠে ঘাস আর রোদ্দুর, দূরে কোনও বাদশাহি সড়ক চলে গেছে গঞ্জ পার হয়ে। কিছু নিঃসঙ্গ গাছ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল আর দু'টো রুগ্ন কুকুর ছাড়া শুধু জনহীন প্রান্তর— তার পর সন্ধ্যায় জাদুকরের হাতের ছোঁয়ায় যেন জমজমাট এক উপনগরী। মাঠময় ছোট ছোট তাঁবু, ঝুলি, খালি প্যাটরা, হাঁড়িকুড়ি, লোকজন। গাছের ছায়ায় কিছু গাধা ঝিমুচ্ছে। মাঠের মাঝখানে শীত নিবারণের জন্য অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। চার পাশে বসে আছে কিছু পুরুষ, আর রূপসি রমণী। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, পরাজিত বিধ্বস্ত পলাতক সৈন্যবাহিনী— জীর্ণ পোশাক পরিচ্ছদে উপস্থিত। কিন্তু সে পলকের জন্য। পরক্ষণেই যখন রঙিন ঘাঘরা দুলিয়ে, ঠুনঠুন কাচের চুড়ি বাজিয়ে, পায়ের মলে বোল তুলে সেই ছিন্ন তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে তারা— যেন স্বপ্নালোকের সুন্দরী, চোখ কালো, চুল কালো, আর আপেলের মতো ফর্সা গাল। মোহময় মাদকতায় চোখ টানটান— চোখে চোখ পড়ে গেলে ভস্ম হয়ে যেতে হয়।

জিপসিদের কথা ভাবলেই এই সব দৃশ্য সজলের চোখে ভেসে ওঠে।

বাড়িটা নিঝুম এখন। কেবল নীলাক্ষমামা এখনও ফেরেননি। তিনি ভিতরের দিকের সদর দরজা দিয়ে বাড়ি ঢোকেন। এ দিকের বারান্দায় আর কারওরও আসার কথা নয়। সে দরজা বন্ধ করে চৌকির নীচ থেকে কঙ্কালের ব্যাগটি টেনে বের করল— ওজন মন্দ না। তার পর মেঝেতে করোটি থেকে পায়ের পাতা সাজিয়ে কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। পাতা কিংবা হাতের হাড় আর্টিকুলেটেড নয় বলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাড়গুলো।

করোটি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সব হাড়ই যে মেয়েমানুষের এ কথা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায় না। যদিও ফিমেল, কারণ অস্থির গঠন থেকে মেল না ফিমেল স্থির হয়। তবে সে নতুন পড়ুয়া। এই অস্থিসকলের মধ্যে ভুলে দু' একটা যে পুরুষের হাড় মিশে যায়নি, তাই বা কে বলবে। তবে অমলদা বলেছে, কঙ্কালটা কোনও মেয়েছেলের। হাড়ের গঠন দেখে মনে হচ্ছে সে যুবতীই ছিল। যুবতী ছিল এই চিন্তা অমলদার নিজস্বও হতে পারে। যেমন সেও কঙ্কালটা কোনও যুবতী নারীর এমনই ভেবে থাকে।

তবে তার সিনিয়র ছাত্রটি জানিয়েছে, সবটাই কোনও নারীর অস্থি। কোনও মিশেল নেই। জগুবাবুর বাজার থেকেই কেনা, সিনিয়র ছাত্রটি এমনও জানিয়েছে।

সে যাই হোক এক জন নারী, যে কিছু কাল আগেও মান অভিমান এবং তীব্র যৌনতা নিয়ে পৃথিবীকে ভোগ করে গেছে— সে এখন নিরীহ একটি কঙ্কাল।

বকুনি, সুব্রতা, মনোরমার মুখও ভেসে উঠল। শুধু তারা কেন যাবতীয় নারী মহিমার এই কঙ্কালই একমাত্র সূত্র। সুব্রতার ব্যবহারে সে কিছুটা ক্ষুব্ধ। তবে কঙ্কালের এই পরিণতিতে সুব্রতাকে সহজেই ক্ষমা করে দেওয়া যায়। যেহেতু বাড়িতে কঙ্কাল ঢুকে গেলে অশুভ আত্মা বিচরণ করে এমন চিন্তা সংস্কার বশে উদয় হতে পারে— সে নিজেও ভুক্তভোগী। সেই অস্থিসমূহের প্রথম সাক্ষাতে তারও কম আতঙ্ক ছিল না। তবে বুঝেছে, ঘাঁটাঘাঁটি করলে সব কিছুর ওপরই মায়া পড়ে যায়। ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বলতে গেলে পাঁচ সাত ঘণ্টার মধ্যেই তার অনেকটা অস্বস্তি কেটে গেছে।

তবে ঘুমিয়ে পড়লে কী হবে, সে জানে না।

হয়তো থলের মধ্যে নড়েচড়ে উঠল। বের হয়ে আসার চেষ্টা করল, তার পর মুখের কাছে অবশ্য যুবতী নারীর যদি কঙ্কাল হয়, চুমো খেতে পারে, গত জন্মের কোনও প্রতিহিংসা যদি বহন করে আনে তবে তার গলাও টিপে ধরতে পারে।

এই অস্থিসমূহের আত্মার মুক্তি ঘটেছে কি না তার জানা নেই। তার নিজের পিতাঠাকুর বার বার বুঝিয়েছেন আত্মা পরমাত্মার অংশ। মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন না ঘটলেই যত আপদ সৃষ্টি হয়। আত্মার মুক্তির জন্যই পারলৌকিক ক্রিয়া, এবং অবশেষে গয়ায় পিণ্ডদান।

এই বেওয়ারিশ নারীর আত্মার কী পরিণতি হয়েছে সে জানে না। আত্মার মুক্তি না ঘটলে এই বাড়ির চার পাশে ঘুরঘুর করতেই পারে।

কিংবা এই ঘরের কোণা খামচিতে লুকিয়ে থাকতে পারে। সে ঘুমিয়ে পড়লে থলের মধ্যে ঢুকে অস্থিসমূহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। তার পর কঙ্কালটি সবার অলক্ষ্যে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতে পারে।

হাড়গুলো থলের ভিতর এক এক করে রাখল— শেষ হাড়টি আবার বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকল কি না— ঘরের আলোতে যতটা পারল খুঁজে দেখল— তবে চৌকির নীচটা অন্ধকার। ডিসেরার ঢাকনা-সহ বালতি এবং একটি টিনের ট্রে ছাড়া চৌকির নীচে আর কিছু থাকার কথা না।

উঁকি দিয়ে দেখল চৌকির নীচে সবটাই অন্ধকার। সে তার টর্চটি খুঁজল, এবং বালিশের নীচে পেয়েও গেল। বালতি সরিয়ে, ট্রে সরিয়ে, ঘরের সর্বত্র খুঁজে যখন অস্থির কোনও আর অবস্থান নির্ণয় করতে পারল না, খুব ভাল করে থলের মুখ এঁটে ডোর দিয়ে কষে বাঁধল—

ঢোকো, যুবতী তুমি আত্মা নিয়ে কী করে ঢুকছ দেখি।

সে আত্মা এবং অস্থিসমূহের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে, আত্মাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালে ভূত ভাগাবার চেষ্টা করছে।

তার পর থলেটি পা দিয়ে তক্তপোষের নীচে ঢুকিয়ে দেবার সময়ই মনে হল, পায়ে কেউ চিমটি কাটছে!

আরে আরে!

খোঁচাটোচা লাগল না তো!

সে টর্চ জ্বেলে বুঝল, না তেমন কিছু না। খোঁচা লেগে হতে পারে। হাড়ের খোঁচা লেগে হতে পারে। সে যে কঙ্কালটিকে নিয়ে এক ঘরে থাকতে ভয় পাচ্ছে—

কী যে করে।

তার খুবই ক্ষোভ হচ্ছিল বড়দির ওপর।

বড়দির কী এত স্বার্থ যে তাকে ডাক্তারি পড়তেই হবে! এত কাঠখড় পুড়িয়ে ডাক্তার হওয়ার যে তার কী দরকার, তাও সে বোঝে না। উদ্ধব দাসের ওপরও সে খেপে গেল, সর্বশেষে বিনয়মামা, তার সঙ্গে ধূপবাতি বিক্রি করতে বের না হলে এত খামোকা নির্যাতনের মুখে পড়তে হত না। আসা ইস্তক এই নারী কঙ্কালটি যা জ্বালাচ্ছে— আর জীবন্ত একটি কঙ্কাল তাকে যে-ভাবে নাস্তানাবুদ করছে, তাতে করে সে দেশে থাকলেও ভাল করত। চেষ্টা চরিত্র করলে প্রাথমিক স্কুলের সে মাস্টার না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না।

ডিসেরা তো এখনও খোলাই হয়নি।

আর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তে চৌকির নীচে খচখচ শব্দ, ধুস, সে উঠে বসল। নড়ানড়িতে চৌকি নড়ে এই অভিজ্ঞতাও তার আছে।

তবে এই মুহূর্তে আতঙ্কে সব বোধই সে হারিয়েছে।

টর্চ জ্বেলে ফের নীচটা দেখল।

না, ঠিকই আছে।

থলের জায়গায় থলে আছে।

ডিসেরার জায়গায় ডিসেরা আছে। তার পর কেন যে মনে হল, ডিসেরাটি কি এই নারীর, না অন্য কারওর। অন্য কারওর হওয়ারই সম্ভাবনা। হাওয়ায় গাছের ডালপালা নড়লেও মনে হচ্ছে, কেউ মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করছে, ডালপালায় প্রতিধ্বনি ঘরের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ালে ভূতের নৃত্য যে মনে হয়, এটাও সে প্রথম টের পেল।

গভীর রাত, এবং অস্থিসমূহের অস্তিত্ব তাকে বোধহয় পাগলই করে দিত। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে গেল।

আপাত স্থির হল, শিকল তুলে দিলে অনেকটা রক্ষা।

থলে থেকে, কারণ থলেটি যা কষে বেঁধেছে, একজন নারীর পক্ষে বের হয়ে আসা কঠিন— আত্মার পক্ষেও থলের বন্ধন ছিন্ন করে ভেতরে ঢোকা কঠিন। আর যদি ঢুকতে পারে কিংবা আত্মা তার দোসরকে নিয়ে বের হয়ে

আসতে পারে, তবে দরজায় এসে নির্ঘাত ধাক্কা খাবে। সুতরাং বারান্দায় শুয়ে থাকাই অধিক নিরাপদ। কী সুন্দর প্রকৃতি, জ্যোৎস্না উঠেছে, গাছের ডালপালা হাওয়ায় যেন উড়ছে। তার একজন শুধু দৈবজ্ঞ দরকার।

কঙ্কালটির আত্মার নির্বাণ লাভ হয়েছে, না হয়নি। মনোরমার গুরুদেব, শুধু মনোরমার গুরুদেব নয়, ওর বাপ ঠাকুরদার কুলগুরুও বটে। তিনি দৈবজ্ঞ এবং তান্ত্রিক— মনে মনে তাঁর স্মরণাপন্ন হতেই, তার ঘুম এসে গেল। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখল সে বারান্দায় শুয়ে আছে। একটি মাত্র বালিশ সম্বল করে এ ভাবে, ঘর ছেড়ে সারা রাত বারান্দায় পড়ে থাকা এবং সেই দৈবজ্ঞই যে তাকে রক্ষা করেছে, এই সব ভাববার সময়ই মনে হল ও দিকের দরজা কেউ খুলছে। সে দ্রুত উঠে বালিশটি বগলে করে ভিতরে ঢুকে গেল।

তার পর থেকে তার বিশ্বাস, বিন্দুমাত্র সংশয় সৃষ্টি হলেই সেই দৈবজ্ঞর স্মরণ, অথচ কী আশ্চর্য তিনি তাকে চেনেন না, তাঁকে সে কোনও দিন দেখেওনি, অথচ রাতে আর তার, আত্মা পরমাত্মার কথা মনেও হয় না। হলেই পরম করুণাময় দৈবজ্ঞের সে স্মরণ নেয় এবং সঙ্গেসঙ্গে এক ধরনের আত্মিক মুক্তি লাভ করে।

ডিসেকশনও শুরু হয়ে গেল।

তার পর সেও ধরা পড়ে গেল।

কারণ ঘরেই আলো জ্বেলে হাড়ের সব বিদঘুটে নামগুলি মুখস্থ করে। এক একটা অংশের এক এক নাম, এত নাম মুখস্থ করাও কঠিন, এবং এই অ্যানাটমি বিষয়টিতেই ছাত্রদের অকৃতকার্য হওয়ার বেশি রেকর্ড, কাজেই সে তো জীবনে কোনও বিষয়েই ফেল করেনি। অ্যানাটমিতেই বা ফেল করে কী করে। দরজা বন্ধ করে ঘুমে জাগরণে, সব সময় হাতে হাড় নিয়ে, একটা দু'টো তো নয়— দু'শো ছয়খানি হাড়, একসঙ্গে তার বিছানায় মেলা হাড় হুড়োহুড়ি হয়ে যায়। চোখ বুজে একের পর এক নাম— এই বুঝি ভুল হল, সে তার হাতের হাড়টি রেখে অ্যানাটমির বই টেনে হাড়টির কার্যকারিতা, দেহের কোন অংশে তার কী কী ফাংশন এই সবের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে কখন ভিতর থেকে এবেলা আসায় তাড়াতাড়ি থলের ভেতর সব ঢুকিয়ে, দৌড়ে গেল। কারণ বড়দি তাকে ডাকছে।

বড়দি বললেন, তোমার আর টিউশনি করতে হবে না। এতে তোমার পড়ার ক্ষতি হয় বুঝি। এত রাত জেগে পড়াও ঠিক না। অসুস্থ হয়ে পড়তে পার। রোজ তুমি পাঁচ টাকা রাহা খরচা পাবে। পাসটাস করে সব ধার শোধ দেবে। কোনও অমত করবে না।

সে বলল, বড়দি অসুবিধা আছে।

অসুবিধা আবার কী হল!

আমার বাবাকে মাসোহারা দিতে হয় টিউশনির টাকায়। টিউশনি ছাড়া বোধহয় ঠিক হবে না।

কী আর বলেন, আর তখনই চেঁচামেচি, বাইরের দিকের বারান্দায় কে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

মেনকা চেঁচাচ্ছে, বড়দি সর্বনাশ হয়ে গেছে, শিগগির আসুন।

সঙ্গেসঙ্গে দু'-লাফে সজল বারান্দায় গিয়ে দেখল, সুব্রতা গোঁ গোঁ করছে, আর তার ঘরের দরজার দিকে আঙুল তুলে কী বলতে চাইছে। আতঙ্কে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মানুষজন জড় হয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। মেনকাদি জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে মুখে। এমন ডাকাবাজ মেয়েটার শেষে এই পরিণতি! সজল তার পরই বুঝতে পারল, দরজা খোলা পেয়ে যদি সুব্রতা ঘরে উঁকি মারে, আর কঙ্কালটা ব্যাগ থেকে হুড়মুড় করে বের হয়ে সুব্রতার সামনে দাঁড়ায়, তবেই সে গেছে।

নীলাক্ষমামা চেঁচাচ্ছে— এই তোর কী হল, ধরাধরি করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলেও গোঁ গোঁ শব্দ সুব্রতার কণ্ঠে।

কী হল, কী দেখাচ্ছিল।

কোনও অপদেবতা যদি ভর করে থাকে, কিশোরী মেয়েদের ওপর অপদেবতার কোপ থাকে, ওর গলায় মাদুলি, হাতে মাদুলি, এত মাদুলি থাকা সত্ত্বেও যখন অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না, মেশোমশাই ঠাকুর ঘর থেকে, চরণামৃত এনে মুখে দিলেন, ফুল বেলপাতা মাথায় ছুঁইয়ে বুকে ছুঁইয়ে দিলেন, এবং সঙ্গেসঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ থেমে গেল, একটি আচমকা শব্দ, ভূত!

ভূত! দিনের বেলায় ভূতের কী এত দরকার একজন নাবালিকার ওপর হামলা করার। বড়দি বললেন, সজল এস আমার সঙ্গে।

কোথায়!

এসই না।

ধরা পড়ে গেল। তার বোকামির জন্যই ধরা পড়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখল, তার বালিশের পাশে মাথার এবং মুখের হাড়গোড় পড়ে আছে। সব জুড়ে দিলে করোটি হয়ে যায়, এবং সেই বস্তুটি ভুলবশত বিছানায় রেখেই বড়দির কাছে ছুটে গেছে— একদম তার খেয়াল নেই।

তার পর যা হয় আদালত বসে গেল!

সুব্রতার কাকি ভয়ঙ্কর খেপে গেছে। তার এক কথা, গেরস্থবাড়িতে এ-সব কী অনাচার!

মেনকা বলল, বড়মামি, সজলদাদা রাত জেগে কী সব করে। হাতে হাড় নিয়ে বসে থাকে। তন্ত্রসাধনা।

বড়দি শুধু বললেন, সজল এগুলি বাড়িতে তুলে আনলে, এক বার বলবে তো। শুভ অশুভ বলে কথা। চলো তোমার ঘরে।

সজল বলল, আমার কিছু করার ছিল না। অ্যানাটমিতে ফেল করলে আমার রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে।

আমি বুঝি সব সজল। রাত জেগে পড়ার বহর দেখেই বুঝেছি, কঙ্কালটি তুমি বাড়িতেই তুলে এনেছ। আমার ছাত্রীও বলেছে, অ্যানাটমি পরীক্ষাটা খুবই কঠিন, শরীরের অ্যানাটমি সোজা কথা। চলো তোমার ঘরে।

বালতিতে কী আছে?

ভিসেরা।

বড়দি কত সহজে সব সমাধান করে দিলেন।

তুমি এক কাজ কর সজল। সব চিলেকোঠায় নিয়ে রাখো। আর প্রথম বছরটা চিলেকোঠায় এই সব হাড়গোড় আর নাড়িভুঁড়ির রহস্য খুঁজে বেড়াও। আমাকে আরতিদি-ই বলেছিলেন, জায়গা দিদি বটে, তবে হাড়গোড় তুলে আনলেই সমস্যা। এই ঘরটা আপাতত খালি করে দাও।

খালি করে দিলেও সুব্রতাকে শেষ পর্যন্ত বোঝানো গেল না। সে বলল, হয় বাড়িতে তোমার ক্যাবলাকান্ত থাকবে, না হয় আমি থাকব। একটা আস্ত কঙ্কাল, আরে ওটা মানুষ!

বড়দি বললেন, ওতে কিছু নেই রে! থালা বাটি বাসনের মতো পড়ে থাকবে ঘরের কোণায়। তুই বাজে বকিস না তো।

অবশ্য রাতে আজকাল বড়দিরও শরীর শিরশির করে। চিলেকোঠা থেকে অনায়াসে নেমে আসতে পারে— কোনও কারণে ঠকঠাক আওয়াজ পেলেই বড়দি ঘরের আলো জ্বেলে দেন। তার পর বারান্দায় আলো জ্বেলে দেন। তার পর টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যান। এবং আশ্চর্য, সজলের বুকে লম্বা একটি হাড়, পড়তে পড়তে, শরীরের অ্যানাটমি মুখস্থ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কারণ সজলের কাছে হাড়টা মানুষের অ্যানাটমি শুধু। তার বেশি কিছু না। সুব্রতাকে ডেকে নিয়ে দেখালেন, মেয়েটার মধ্যে কঙ্কালের ভয় এখনও এত তাড়া করছে যে, তাকে কিছুতেই আয়ত্তে আনা যাচ্ছিল না। সে দেখুক। দেখে যদি হাড়কে হাড় ভাবতে শেখে।

**শেষ পর্যন্ত হুকুম** সিংই সজলকে কুঠি বাড়ির ইতিহাস, জিপসিদের আচার বিচার, ভারতীয় সমাজের মতোই এ-সব বিষয়ে তাদের মধ্যে যে নানাবিধ কড়াকড়ি, নানা নিয়ন্ত্রণ, তবে সম্প্রদায় ভেদে কিছু কিছু রীতিভেদ আছে এমন বলেছে।

আজকাল সজল বিকালের দিকে হাসপাতাল থেকে সোজা কুঠিবাড়িতে চলে আসে।

সজল না এলে মনোরমা বারান্দার সোফায় বসে চোখের জল ফেলে। তার বিষণ্ণতা বাড়ে। মেয়েটি যেমন জেদি তেমনি সরল। তার উচ্ছ্বাস মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টায়।

হুকুম সিং সজলকে এখন খুবই মান্য করে। সে পাঁচিলের কাছাকাছি এলেই দুখপ্রসাদ দৌড়ে যায় এবং গেট খুলে দেয়। তাকে সেলাম দেয়। এবং সে হেঁটে এলে তার পিছু পিছু দুখপ্রসাদ অনুসরণ করে।

মনোরমা উচ্ছ্বাসে দৌড়ে যায়, তার পর সেও সজলের সঙ্গে বারান্দায় উঠে আসে।

সজল ফাইনাল এমবিবিএস পরীক্ষা পাস করার পরই মনোরমা অসুস্থ হয়ে পড়ে। মদন পাণ্ডে খবর পেয়ে যোশীমঠ থেকে নেমে আসেন। সরযূপ্রসাদের সঙ্গে আসার কথা ছিল। তবে তিনি আসতে পারেননি। সেখানকার অফিস, স্কুল, হাসপাতাল, গিরিগোবর্ধন মন্দির এবং ধরমশালা দেখাশোনার ভার সরযূপ্রসাদের ওপর। তিনি অবশ্য সমতলে নেমে এলে এমনিতেই মাঝেমাঝে এখানে চলে আসেন। মদন পাণ্ডেও আসেন, তবে কম। কারণ তার কেন যে মনে হয় অলকনন্দা ছেড়ে গেলেই তাঁর জীবনহানির সংশয়। গুরুদেবের নির্দেশ না নিয়ে তিনি কোথাও যান না। চার

পাশে পাহাড়, এবং বরফে আচ্ছাদিত শৃঙ্গ আর অলকানন্দা নদীর কলকল কলতান ভিতরে তার এক মধুর অনুরণন সৃষ্টি করে— অবশ্য এই সব অনুভূতি-মালার কথা কাউকে বলা যায় না, তবে সজলকুমারকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে ছেলেটার মধ্যে কোনও পাপ নেই। দীর্ঘকায় এবং ফর্সা রঙের এই যুবক— তার কন্যার শুধু চিকিৎসার ভারই নেয়নি, দরকারে এই গৃহে রাত্রি জাগরণ থেকে সব রকমের সেবা শুশ্রূষায়ও অংশ নিয়েছে। মিনি নার্স কিংবা টুকিপিসির ওপর সজল ঠিক নির্ভর করতে পারেনি বলেই রাতে থেকে গেছে। তার ইন্টার্নশিপ শুরু হবে বলে ডঃ চামারি হস্টেলে তাকে থাকার জায়গাও ঠিক করে দিয়েছে কলেজ। সে কোথায় আছে না আছে, এই নিয়ে বড়দিকে কৈফিয়ত দিতে হয় না।

প্রথমে সামান্য জ্বর।

পরে জ্বর রেমিশন হয় না।

কোনও ইনফেকশন থেকে জ্বর, ওষুধ খেলে সেরে যাবে। তবে নিরাময় না হওয়ায় সজল তার স্যারকেও এক দিন গাড়ি করে নিয়ে এসেছিল— তিনি ফের রক্ত, থুথু এবং ইউরিন পরীক্ষাসহ তলপেটের দু'টো এক্সরে-র কথা বলে যান।

শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি।

আর কেন যে সজলের মনে হয়েছিল, মনোরমার অবসাদ থেকেই অসুখটা।

মনোরমা ঘাঘরা এবং ঢোলা ব্লাউজ পরলেই বোঝা যায় আবার মাসাধিককাল কিংবা তারও বেশি সে অবসাদের শিকার হতে যাচ্ছে।

সে তখন কারওর কথা শুনতে চায় না। চান করতে চায় না, অথচ কড় ঝলমলে ঘাঘরা পরে আয়নায় সে সাজতে বসে যায়। তার থুতনিতে এমনিতেই সুন্দর উলকি আঁকা আছে— কবে কে এই উলকি এঁকে দিয়ে যায় কেউ জানে না। তার মা কুমরির কাজ কি না কে জানে। কারণ হুকুম সিংই তাকে জানিয়েছে, কুমরার বিবিকে পাণ্ডে সাহাব এই বাড়িতে তুলে এনেছিলেন। তখন কত আর বয়েস পাণ্ডে সাবের— সেন্টজেভিয়ার্সে পড়েন, আর এই এলাকার বলতে গেলে তখন লোফার চূড়ামণি তিনি। এ নিকটায় বাড়িঘরও বিশেষ ছিল না, খালের ও পারে হাড়কল, আর জলা আর কচুরিপানার জঙ্গল, মশার উৎপাত, সরকার বাড়ি আর নস্করবাড়ি ছাড়া প্রাসাদতুল্য কোনও বাড়িঘরও ছিল না। বুড়ো সাহাব তাঁর একমাত্র লম্পট পুত্র উচ্ছন্নগামী হয়ে যাবে চিন্তাই করতে পারেননি। কুমরাকে পয়সার লোভ দেখিয়ে তার বউকে হাত করে। তখনও এই কুঠিবাড়ির সঙ্গে প্রতিবেশীদের কারওর কোনও সম্পর্ক ছিল না, এখনও নেই। বানজারার দলটা নস্করদের তালবাগানে তাঁবু ফেলে আছে, আর কুমরা আর দশটা বানজারার মতো পরিশ্রমী নয়, কুড়ে, বউকে খেতে দিতে পারে না। বউটার দোষও দেওয়া যায় না এবং বুড়ো বাবুজি খবর পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সোজা আম্বালা থেকে গাড়ি করে চলে আসেন। এ মোকামের দেখভাল তখন তার ওপর। বুড়ো বাবুজিকে না জানিয়েও উপায় নেই। পাণ্ডেসাবের পত্নী অনুরাধা মাঙ্গরী গায়েগতরে কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে গেছে— এত বড় কেলেঙ্কারি বুড়ো বাবুজি সহ্য করেন কী করে, গোপনে এই কুঠিবাড়িতেই ফের কুমরিয়ালিকে রেখে দেন। এবং পাণ্ডে সাহেবেরও অজ্ঞাতবাস শুরু হয়।

সজল প্রশ্ন না করে পারেনি, অনুরাধাদেবী কি পাণ্ডে সাহেবের বিয়ে করা স্ত্রী?

তবে আর কী বলছি ডাক্তার সাব! তার স্বামী এখানে অজ্ঞাতবাসে আছেন, তিনি কোনও খোঁজখবর নিতেন না। রুমালির আট বছর বয়সে কুমরিয়ালি ফের রাতে উধাও হয়ে যায়। আর খুঁজে পাওয়া যায়নি! বানজারাদের দলে কুমরার কাছেই বোধহয় ফিরে গেছে।

বানজারা বলছ কেন? কুমরিয়ালি তো শুনেছি খাটালে এক বৃদ্ধার সঙ্গে থাকত।

কার কাছে শুনলেন ডাক্তারসাব। সব উড়ো কথা। কুমরিয়ালি জিপসিদের মেয়ে। মনে রাখবেন জিপসিও যা, বানজারাও তাই, এদের মেলা উপগোষ্ঠী আছে। দেশ ভেদে নাম ভেদ ঘটেছে। মানুষ জিপসি প্রায় সব দেশেই আছে। তারা এক জায়গায় থাকে না। দল বেঁধে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়। মাঠে কিংবা গাছের নীচে, নদী তীরেও তারা আস্তানা গড়ে। দলের পুরুষরা হয় কর্মকারের কাজ করে, কেউ ভালুক, বাঁদর নাচায়, আবার দড়ির খেলাও দেখায়। সবচেয়ে প্রিয় কাজ ওদের গেরস্তকে ঠকানো। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ ওস্তাদ। গাজোদের ঠকাতে পারলে তারা খুব মজা পায়। গাজোদের ঠকাতে পারলে তাদের পুণ্য হয়।

সজল অবাক হয়ে শুনছে। কিন্তু গাজো মানে কী সে জানে না।

গাজো আবার কারা।

গাজো হল যে ডাক্তারসাব গেরস্ত মনুষ। যাদের স্থায়ী আবাস আছে, জিপসিরা তাদের পাপী মনে করে। দলের নারী-পুরুষ সবাই কোনও না কোনও ভাবে উপার্জনের চেষ্টা করে, এদের মেয়েরা ভাল হাত দেখতে পারে। জিপসিদের মধ্যেও বৃত্তি বিকাশ হয়েছে, রয়েছে পেশা অনুযায়ী নাম। জিপসিরা কাজ হাসিল করতে যখন যেমন গল্প বলার দরকার তাই বলে। কাজেই কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা বোঝা মুশকিল। এরা কোনও কোনও অঞ্চলে নিজেদের রোম বলেও চালায়। রোম মানে খাঁটি মানুষ। ইউরোপ, আমেরিকায়, ইরান, আফগানিস্তান সর্বত্রই এরা ঘুরে বেড়ায়। এরা ঘোড়ার ব্যবসা করে। কেউ ছুরি-কাঁচি শান দেয়। আর এদের প্রাণশক্তি খুব প্রবল, নৃত্যগীত বিলাসী। নর্তকীদের এ জন্য খাতির বেশি। বেহালা, ডুগডুগি, খঞ্জনি বাজিয়ে সন্ধ্যায় আসরে তারা নৃত্যগীতে মশগুল হতে ভালবাসে।

হুকুম সিং সুযোগ পেলেই জিপসি প্রসঙ্গে চলে আসে। জিপসিরা দুষ্ট, চোর জিপসি সুন্দরীরা সহজেই যে কোনও পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে, শরীর দিয়ে পয়সাও ভিক্ষা করে। মনোরমা কিংবা রুমালি যে নামেই ডাকা হোক, সজল জানে, কুমরিয়ালির গর্ভে অর্থাৎ এক জিপসি রমণীর গর্ভে মনোরমার জন্ম। এবং এই যে মনোরমা মাঝেমাঝে কথা বন্ধ করে দেয়, সারা দিন শুয়ে থাকে, বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সে হাত ভর্তি কাচের চুড়ি পরে, কানে ঝুমকো, নাকে নথ পরে, এবং মাথায় টিকলি পরে নিজেকে শুধু আয়নায় দেখে। কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। স্নান করে না বলে শরীরে আদিম গন্ধ। এবং কারওর দিকে যদি তাকায়, তবে মনে হয় চোখ দু'টো তার জ্বলছে— সে কি তার মা-র মতো ঘর ছাড়া হতে চায়। কিংবা এক আতঙ্ক এই পরিবারে, কুমরিয়ালি পালিয়ে যাবার সময়, রুমালিকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু দুখপ্রসাদের কাছে ধরা পড়ে সে মেয়েকে ফেলেই পালায়। বাবুজি, যে এত পাহারার ব্যবস্থা রেখেছেন, বেচারা। রুমালি শেষ পর্যন্ত সবাইকে ফাঁকি দিয়ে যদি নিখোঁজ হয়ে যায়। বাবুজির তো একমাত্র ঔরসজাত সন্তান এই রুমালি। সেই তাঁর অবলম্বন। বাইশ বছর বয়স না হলে মনোরমার বিবাহ নিষিদ্ধ। বাবুজির গুরুদেব একজন দৈবজ্ঞ, সে বিশ্বাস তারও আছে। কারণ আত্মা-পরমাত্মার চিন্তায় সে যখন কঙ্কালটি নিয়ে একা একা ঘরে রাত কাটাতে ভয় পাচ্ছিল, এবং ঘুম আসছিল না— তখন সেই দৈবজ্ঞই তাকে রক্ষা করেছে। দৈবজ্ঞের ওপর নির্ভর করতেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

মাঝেমাঝে মনে হয় সজলের, মনোরমা যৌনতায় দগ্ধ হয়ে নিজেকে বেসামাল করে তুলছে। জিপসি মেয়েরা কি অতিরিক্ত মাত্রায় যৌনগন্ধী। শরীরে সাময়িক ভাবে কখনও বোধহয় তার উষ্ণতার প্রবল ঢেউ তৈরি হয়। এক জন সমর্থ যুবকের জন্য যদি পাগল হয়ে ওঠে ভিতরে ভিতরে।

তখনই হুকুম সিং টেবিলে এক কাপ কফি রেখে বলল, দিদিমণি পাঠাল। এক প্লেট স্যান্ডউইচ, এক গ্লাস ডাবের জল। এবং এক প্লেট ডিমের পোচ।

দিদিমণিকে ডাকো। একা একা কাঁহাতক থাকা যায়।

আসবে না।

আমার সঙ্গে দেখা করতে লজ্জা!

না তা না। যাবার সময় আপনাকে দেখা করে যেতে বলেছে।

তার পর হুকুম সিং কুঠিবাড়ির এত সব ঘটনায় সাক্ষী তুমি। তুমি যে তীর্থযাত্রীদের মোট বইতে খবরটা তা হলে সত্যি নয়।

সত্য অসত্য বলে কিছু নেই বাবু, সবই জীবনে ঘটে। তার পরই হুকুম সিং এ দিক ও দিক তাকিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয় রুমালি দিদিমণির সত্যি কোনও অসুখ আছে।

রুমালির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও আলোচনার মধ্যে যেতে চায় না সজল। সত্যি অসুখ কি না, সে নিজেও তো জানে না। মেয়েটা যদি কামনার জ্বরে ভোগে, ভুগতেই পারে— রক্তে তুফান না উঠলে, এ ভাবে কেউ তাকায়ও না। যাবার আগে দেখা করে যেতে বলেছে, সেই চিবির ঘটনাও স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কত সহজে পাগলের মতো তাকে জড়িয়ে ধরেছিল— লাজলজ্জার বালাই ছিল না। মা জিপসি, জিপসির রক্ত শরীরে থাকলে কি এমন হয়! জিপসি মেয়েরা কি অতিরিক্ত মাত্রায় যৌনকাতর!

আচ্ছা হুকুম সিং জিপসিরা শুনেছি ভারতবর্ষ থেকেই ইউরোপ, ইজিপ্ট, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরানে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে জিপসিদের আলাদা রক্ত, আলাদা জাত কেন হবে। হয়তো সবাই ভারতীয়।

হুকুম সিং হেসে ফেললেন, আপনি খান তো বাবু। কফি ঠান্ডা হয়ে গেল।

এই ভাবে কেন যে সজল মাঝেমাঝে মনোরমার কথা ভাবতে ভাবতে এক সুদূরপ্রসারী চিন্তায় ডুবে যায়। হুকুম সিং ঠিকই বলেছে, বাইরের দুনিয়ার হাতছানি, অন্য দিকে স্বদেশি সমাজের তাড়না আর বাইরের আকর্ষণ সে দিন যুগপৎ দুই-ই সক্রিয়। হুকুম সিং-এর মতে ভবঘুরেরা অধিকাংশই ভারতের পতিত সম্প্রদায়ের। ওরা স্বদেশেও ছিল কর্মকার, জুয়াড়ি, গণৎকার, হাতি-ঘোড়ার পালক এবং পেশাদার নর্তকী এবং গায়ক। তখন মনুর বিধানে

এরা এ দেশে অস্পৃশ্য। সমাজে অবাঞ্ছিত। শকরা বাইরে থেকে এসেছে, তারা কেন মানবে সমাজের এই সব বিধান— তারা সত্যিকারের কাজের মানুষ চায়। দেশে আলাদা উদাসীন এক সমাজ হিসাবে চিহ্নিত। মান নেই, ইজ্জত নেই, জমি নেই, ঘর নেই। সুতরাং বন্ধনও নেই। সেই রক্তের দোষেই মনোরমা হয়তো কোনও বন্ধন স্বীকার করতে চায় না। প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির মধ্যেই সান্ত্বনার খোঁজে সে পাগল হয়ে থাকে।

এই ভাবে সে আজকাল জিপসিদের সম্পর্কে কোনও বই পেলে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পড়ে। এবং আশ্চর্য, মনোরমাই এক দিন তাকে তার বাবার আলমারি খুলে বলেছিল, ভারতীয় জিপসিদের সম্পর্কে বাবুজির সংগ্রহ যথেষ্ট মূল্যবান। এখানে সেখানে না ছুটে এই লাইব্রেরি ঘরটা ব্যবহার করতে পার। হুকা সিং-এর কথা বিশ্বাস কোরো না, বড্ড আবোল-তাবোল বকে।

সজল তার পরই জানতে পারে ভারতীয় যাযাবর সম্প্রদায় ভাগ করা আছে ছয় ভাগে — ভানটু, বানিয়া, বানজারা, বওরিশ, ঝিলিক, ঢুরা। ডোম, মিরাক্ষী, সাপুড়িয়া, এরা অবশ্য আলাদা ভাগ। ডোমেদের দু'টো ভাগ, এক ভাগে পড়ে বানিয়া-ডোম, ওরা নাচে গায়।

আরও কত রকমের যে যাযাবর জাতি— এরা নিজেদের সম্পর্কে প্রত্যেকেই খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে। বানজারাদের আদিপুরুষ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলবে— তারা বনেদি রাজপুত। এক সময় তারা রাজসভার কবি ছিল। অবশ্য গবেষকরা মনে করেন ওরা উচ্চ বর্ণের রাজপুতদের ভৃত্য ছিল। আবার এদেরই অপর শাখার দাবি, ভাজোরি নামে এক বিখ্যাত রাজপুত নর্তকীর বংশধর তারা। ভাজোরি নর্তকীকে নিয়ে এদের মধ্যে অজস্র কিংবদন্তি— যেমন এক বার গুর্জর রাজদরবারে দড়ির উপর ভাজোরি নাচ দেখাচ্ছিল। রাজা বললেন, এই সোনার হার ছুড়ে দিচ্ছি, নাচতে নাচতে যদি ধরতে পার। তবে এটি তোমার। ভাজোরি তাল ভঙ্গ না করেই সেটি লুফে নিল। আর রাজাকেও নেশায় পেয়ে গেল। তিনি একের পর এক পুরস্কার ছুড়ে দিতে লাগলেন— শেষে রাজ্যই দিয়ে দেওয়ার উপক্রম। দর্শকদের মধ্যে ছিল ঈর্ষাকাতর এক নর্তকী। সে তখন ঈর্ষায় ভাজোরির তাল ভঙ্গ করার জন্য পাশে বসা একটি বাচ্চা ছেলের গায়ে চড় মেরে বসল। ছেলেটি জোরে কেঁদে উঠতেই চমকে গিয়ে দড়ি থেকে পড়ে মরে গেল ভাজোরি।

আর মাঝেমাঝে মনোরমার কথা ভাবতে ভাবতে সজল নিজের মধ্যে ডুবে গেলে এক দূর অতীত যেন ভেসে ওঠে— ইতিহাসের এক অশান্ত অধ্যায় সেটা— অতএব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঘর ছাড়ার ব্যাপক প্রবণতা। যারা যুদ্ধে বন্দি হল না তারা চলল বন্দি ভাইদের পিছু পিছু। ওরা সবাই যেন পশ্চিমের যাত্রী। হানাদারদের আগমনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, সীমান্তের ও পারেও মুলুক আছে। সম্ভাবনাময় অন্য দুনিয়া। আর পুব থেকে পশ্চিমে তো মানুষেরই যাত্রা, যেমন অনন্তকাল ধরে সূর্যেরও সেই পথ—

হাজার হাজার মানুষ, সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, অস্তলোকের খোঁজে বের হয়ে পড়েছিল তারা। অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হেঁটে গেছে সেই অস্তলোকের খোঁজে। কোনও দল পায়ে হেঁটে, কোনও দল ঘোড়ার পিঠে। গাধা আর ঘোড়া জিপসিদের খুবই আদরের প্রাণী। সব প্রাণীর মাংসে খেতে রাজি কিন্তু কখনও ঘোড়ার মাংস নয়। কেউ মারা গেলে জিপসি তার আদরের ঘোড়াটাকেও সঙ্গে কবর দেয়।

জিপসিদের ইতিহাসে ভ্রমণের বিস্তারিত খবর থাকে— এরা আসলে ভ্রমণ পিপাসু।

মনোরমা এক সময় তার বাবুজির সঙ্গে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন সে শান্ত থাকে, হুকুম সিং অবশ্য কিছু ভেজাল বিবরণও দেয়।

যাবার সময় দেখা করে যেতে বলেছে, দেখা না করে গেলে আবার কী অশান্তির সৃষ্টি হবে কে জানে, তারও ইচ্ছে হয় মনোরমার সান্নিধ্য পেতে, কিন্তু মুশকিল তার পারিবারিক পরিমণ্ডল, মনোরমা আর তাকে কেন্দ্র করে যদি কোনও কুৎসা রটনা হয়।

কারণ সুরভিমামি কাজ সেরে বস্তিতে গেলে, মামা ঠিক জানতে চাইবে, সজলের সঙ্গে তোমার দেখা হল সুরভি? সে কি ও বাড়িতে আজও এসেছে। শেষ পর্যন্ত ভাগ্না একটা ডাইনির পাল্লায় পড়ে গেল।

সুরভি মুচকি হেসে বলবে, গোপালদাদা কমালিকে ডাইনি বলছ কেন, কমালি আসলে পরি এমন সুন্দরী রূপসী এই শহরে কোথায় খুঁজে পাবে।

সুরভি তুমি থামো। অজাত-কুজাতের মেয়ে— জাত ঠিক নেই, রূপ ধুয়ে কি ওর বাবা জল খাবে। এমনিতেই দেশ ছাড়া, এখন জামাইবাবুর অবশ্য দিন ফিরেছে, ভাগ্নার উপার্জন ভাল, তাই বলে তুই ওখানে পড়ে থাকবি।

মাঝেমাঝে কচুরিপানার জলা পার হয়ে সেই বস্তিটায় সে সময় পেলেই যায়। আর তখন মামা-মামিরা তাকে ঘিরে ধরে, অসুখ না থাকলেও অসুখের কথা বলে, আর অহঙ্কারও মেলা, ভাগ্না তাদের সঙ্গে এই বস্তিতে কত কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে। আদর্শ বালিকা বিদ্যাপীঠের বড়দিরও গুণগান করে, এবং এই যে সজলকে তিনি তাঁর বাড়িতে তুলে নিয়ে গেছেন— কোনও স্বার্থ নেই ভাবলে কি হয়।

কুঠি বাড়িটার ভেতরে সে কখনও একা ঢোকেনি। সজলের মনে হয়, একা ঢুকলে, ঘরের ঘুরপথেই ঘুরে মরবে। বিশাল বারান্দাটাই এ জন্য তার প্রিয় জায়গা। মনোরমা ডেকে না পাঠালে, সে কখনও তার সঙ্গে দেখা করে না। বনেদি পরিবারগুলির মতোই এই কুঠিবাড়িরও অন্দরমহল আছে। ইচ্ছা করলেই যে কেউ ঢুকে যেতে পারে না। তবে মনোরমার অসুখের বাড়াবাড়ির সময় এই বাড়িতে তার রাত জাগরণ গেছে।

অদ্ভুত উপসর্গ সব।

তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

তার গা গোলাচ্ছে। পেটে ব্যথা।

আর প্রচণ্ড মাথাধরা। জ্বর।

তার পর তো কিছু ক্ষণ চোখ বুজে পড়েই ছিল।

কোনও ডাকাডাকিতে সাড়া দেয়নি! কেমন এক ঘোরের মধ্যে যেন ডুবে গেছে। এক সময় তো নাড়িও খুঁজে পাচ্ছিল না। অথবা তার মনে হয় সেও কোনও ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে— এবং তার অসুখ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি দেখে তার সারকে নিয়ে না এলে বুঝতেই পারত না, আসলে মেয়েটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। এবং সজলের অনুমানই সত্য। মনোরমার চোখমুখ দেখলেই বোঝা যেত, আবার তার বুঝি মানসিক অবসাদ শুরু হবে। মনোরমার এই অবসাদের জন্য সে কখনও কখনও নিজেকেও দায়ী মনে করে। মনোরমা যে কখনও কখনও পাগলের মতো রতিমুখর হয়ে ওঠে, তারও ইচ্ছা করে মনোরমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে। কিন্তু পারে না। মনোরমা নষ্ট মেয়ে হয়ে গেলে সেও যে নষ্ট হয়ে যাবে।

তুমি আজ থেকে যাও ডাক্তার।

দেখি।

কারণ সেই মুহূর্তে দেখি না বলেও উপায় থাকে না। সোজাসুজি বলে দিতে পারে না— এ হয় না মনোরমা— তোমার ভবিষ্যৎ আছে। তোমার বাবা জানতে পারলে আমার উপর বিশ্বাস হারাবেন। রাতে থাকলে, বস্তি বাড়িটায় খবর চলে যাবে।

তা হলে ভাগ্না এই কুঠিবাড়িতে রাতও কাটাচ্ছে।

কোনও মোহ না থাকলে কেউ অনাত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটায়! বাড়ির অভিভাবকও তো কেউ মনোরমার কাছে থাকে না। মেয়েটাকে একা ফেলেই বা রেখেছে কেন। কাজের লোকগুলি, যেমন মিনি নার্স, দুঃখপ্রসাদ, টুকিপিসি এবং তার পলাতক প্রেমিক দেবেন পর্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। শেষ পর্যন্ত সরল সোজা মেয়েটার এত বড় সর্বনাশ— ছিঃ।

কাজেই সে যাচ্ছে ঠিক এবং সবাই জানে মানুষটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য, ভালবাগানের ঢিবিতে হুকুম স্বচক্ষে দেখেছে অবুঝ মেয়েটা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বাবুটিকে জড়িয়ে ধরা সত্ত্বেও বাবুটি তাকে বার বার নিরস্ত করেছে।

ভালবাসা।

জিপসি জীবনকে ভালবাসে। দেওয়ালে বড় বড় ছবি, ভালবাসার ছবি, স্নানরতা মেয়ের ছবি থেকে ক্যারাভানের ছবি, সজল জানে না, এই সব অমূল্য ছবি কার আঁকা। জিপসি তরুণীরা সাজতে ভালবাসে। রতিসুখের চিন্তায় পাগল থাকে। স্তন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র স্পর্শকাতর নয় তারা।

সজল কত দিন দেখেছে ঢোলা ব্লাউজের ফাঁকে স্তন যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু মনোরমার হুঁশ নেই। যেন তার এই স্তন মুখেরই মতো সৌন্দর্যের চিহ্ন। পুরুষের এই স্তন দর্শনে লজ্জার কোনও হেতু থাকে না। প্রকাশ্যে সন্তানকে তারা যেমন স্তন দানে ইতস্তত করে না, তেমনি গর্বিতা জিপসি তরুণী তার যৌবন মহিমা গোপন করার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না। কেননা তারা অঙ্গে নিজেদের জননী বলেই ভাবতে শেখে।

সুতরাং সজল জানে না, এই নারী তার ক্ষীণ কটি এবং অনাবৃত স্তন দেখানোর লোভে কেন ডেকে পাঠিয়েছে কি না। তার আকর্ষণের প্রতি সজলের এই বিরূপতা অসহ্য, কারণ সে তখন মনোরমার দিকে তাকায় না, দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, কিংবা মাথা নিচু করে কথা বলে।

তবে সজল এও জানে স্তন সম্পর্কে জিপসি তরুণীরা বেশ ঢিলেঢালা। কারণ 'জিপসি চরিত' পড়ে বুঝেছে, রাস্তায় কলের জলে জিপসি তরুণীরা ঊর্ধাঙ্গ খোলা রেখেই গাত্র মার্জনা করে। মেয়েদের বুক সম্পর্কে 'গাজো'র কৌতূহল জিপসিরা এখনও বুঝে উঠতে পারে না, মেয়েরা পর্যন্ত তাই নিয়ে না কি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। নারীদেহে বুকের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় পা, উরু, উরুসন্ধি এবং তলপেট।

অঙ্গাভরণে জিপসি মেয়ে চিরকালের রূপ সাধিকা।

হাতের প্রতি আঙুলে আংটি পায়ের প্রতি আঙুলেও আংটি, রঙবেরঙের চুড়ি, বালা ইত্যাদি অনেক সময় কবজি থেকে শুরু করে কনুই ছাড়িয়ে উঠতে থাকে। গলার হারও যথেষ্ট বিচিত্র, পাথরের মালা, পুঁতির মালা, রুপোর হার, এবং বিভিন্ন দেশের জোগাড় করা নানা কালের মুদ্রার ছড়া। কানে গোল মস্ত ইয়ারিং, কিংবা ঝুমকো, নাকে বিচিত্র আকারের নাকছাবি।

এই সব গয়না অথবা উলকি নানা কারণে তাদের কাছে জাদুগুণ সম্পন্ন। ভূত-প্রেতের ভয় থেকেও এই সব জাদুগয়না তাদের আত্মরক্ষা করে। গেরস্থ মানুষের নজর পর্যন্ত এই সব জাদুগয়নায় প্রতিরোধ্য, তাদের আগুন খেকো চোখ সহজেই ঝাপসা হয়ে যায়। সহজেই সুন্দরী জিপসিরা গাছের আড়ালে ছায়ার মতো তখন পলকে হারিয়ে যেতে পারে।

এই সব ভাবতে ভাবতেই সজল এক একটা ঘরে, কখনও করিডোর পার হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে মনোরমাকে কী অবস্থায় দেখবে তাও সে বুঝতে পারছে না। আবার মাঝেমাঝে কেন যে তার মনে হয় খুন কিংবা অপহরণের আতঙ্কেও মনোরমার মধ্যে অবসাদ দেখা দিতে পারে। সাধুসন্তদের ভিড়ও আছে এই বাড়িটায়, বিশেষ করে গঙ্গাসাগর মেলায় যে সব সাধু সমতলে নেমে আসে তাদের কেউ কেউ এই কুঠিবাড়ির হদিস জানে। নানা প্রকারের দানধ্যানেরও ব্যবস্থা থাকে। চাল, ডাল, কম্বলও দান করা হয়। আমলকি গাছের ছায়ায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে শীত থেকে পরিত্রাণের জন্য কাঠের ধুনিও জ্বালা হয়ে থাকে। এবং এই দানের লোভে বছরে দু'-চার বার তারা কেউ কেউ যে ফের উদয় হয় না, তাও বলা যাবে না। তখনই কিছু দেখে মনোরমা টের পেতে পারে তাকে কেন্দ্র করে গুপ্তচর বৃত্তি সেই সমানে চলছে।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মনোরমা যাই হোক কিছু করছিল। শুধু পা জোড়া দেখা যাচ্ছে, গলা খাকারি না দিয়ে ঢোকা যায় না। পায়ে মল, এবং রঙবেরঙের ঘাঘরা যে পরে আছে তাও বোঝা যায়।

গলা খাঁকারি দিতেই মনোরমা দ্রুত উঠে বসতে গেলে ঘাঘরা খানিকটা ওপরে উঠে গেল। এবং দু' উরুর ফাঁকের কিছুটা অংশ উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে পাগল করা এক বন্য আদিম গন্ধে সজলের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে পড়ায় সে বুঝল দগ্ধ যৌনতার কবলে পড়লে শরীরের কেন এই পাগলাদশা হয়।

এই মুহূর্তে মনোরমা তাকে জড়িয়ে ধরলে সে যে বাধা দিতে পারত না, কারণ বন্য আদিম গন্ধ নারীর উরুদ্বয়ের ভিতর থেকে উঠে আসছে, চোখে সে ঘোলা দেখছে সব কিছু যেন, এবং তার শরীর কাঁপছিল।

কী হল, বোসো।

মনোরমা সরে বসল।

তার পর হাত টেনে কী দেখল— জিপসি রক্ত এই নারী বহন করে চলেছে, জিপসি মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে ভাল হাত দেখতে পারে— হস্তরেখা দেখে যদি কিছু বলে!

কেন যে মনোরমা বলল, পুরুষ নিজেকে কীভাবে ঠকায়, তোমাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। দেখ ডাক্তার, পুরুষ মানুষের সাহস না থাকলে নারীর আর কোনও অবলম্বন থাকে না। অন্তত একদণ্ডের জন্য ভোগ করে আমায় মুক্তি দাও। কোনও ছলনা নয়, কোনও গঞ্জনা নয় শুধু করুণ আবদার নারীর।

আর পারছি না। সে আর পারে! সে তো মানুষ! নারীর এই আর্তনাদ তাকে পাগল করে তুলল। কত ক্ষণ ধরে এই যৌনবিহারে তারা মত্ত ছিল, কারণ বেহুঁশ হয়ে প্লাবনে যেন দু'জনেই সাঁতার কেটেছে। তাপদগ্ধ শরীর ঝর্নার জলে স্নিগ্ধ হলে সজল উঠে বসল। যা ঘটে গেল এবং যে-ভাবে সে ভোগ করল আদিমতাকে, তাতে সেও যেন তার মুক্ত এবং মনোরমার এই অনাবৃতা রূপ ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার যেন প্রকাশ।

সে ডাকল, মনোরমা।

বেহুঁশ, সাড়া নেই।

ওঠো। আমি যাব।

কেমন ঘুমে অচ্ছন্ন কণ্ঠে মনোরমা শুধু বলল, আমাকে একা ফেলে চলে যাবে!

মনোরমা তার দিকে না তাকিয়েই কথা বলছে।

হস্টেলে ফিরতে হবে না?

এক দিন না ফিরলে হয় না।

পাগলামি কোরো না মনোরমা, প্লিজ ওঠো। দরজা বন্ধ করে দাও।

তপ্ত চৈত্রের দহন জ্বালা বারি বর্ষণে যেন স্নিগ্ধ মনোরমা। সে উঠে বসল, এবং লজ্জায় দ্রুত ঘাঘরা দিয়ে শরীর ঢাকতে গিয়ে বুঝল, সবটাই প্রায় চ্যাটচ্যাটে আঠার মতো— উত্তপ্ত জলে এবং বীর্যে। রোমন্থনে শরীর থেকে নির্গত হয়েছে আশ্চর্য এক বিস্ময়, রক্ত এবং মূত্রসহ সব অবসাদ নির্গত হলে এমনই বুঝি হয়, অথচ কী স্বর্গীয় তৃপ্তি। ঈশ্বর মহিমার চেয়েও প্রবল এই শরীরী সৌন্দর্য।

এত আনন্দ, এত আনন্দ!

এত সুজলাসুফলা শস্য শ্যামলা!

এত সীমাহীন আত্মার তৃপ্তি!

সুন্দর ছবি এঁকে দিল কেউ যেন শরীরে।

তার পরই মনোরমার কাতর উক্তি, ডাক্তার তুমি আমার ঈশ্বর। এই যে ভুবনমনোমোহিনী আখ্যান অথবা ঈশ্বরের ক্ষমতার বাইরে।

কিন্তু সেই বন্য আদিম গন্ধ দু'জনের মধ্যে জাপ্টাজাপ্টি হয়ে গেছে। নারীর গন্ধ সেও বহন করছে, তার হাতে সেই ঘ্রাণ, শুধু হাতে নয় গোটা শরীরে। সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে সাবান দিয়ে সহর স্নান সেরে বের হয়ে বলল। এ বার তুমি যাও। তুমি পরিতৃপ্ত নারী।

মনোরমা বলল, আমার পরিতৃপ্ত পুরুষ। বলে ঠোঁটে দুম দুম খেল। তার পর বলল, আমার সব কিছু লয় হয়ে গেল তোমার মধ্যে। আমি তোমার পাগলিনী রাধা।

চামারি হস্টেলের একতলায় একটি ফোন আছে। সেই ফোনের নাম্বার সজল একমাত্র বড়দিকেই দিয়েছে। আজ কেন জানি মনে হল সে তার ফোনের নাম্বার মনোরমাকে না দিয়ে অন্যায় করেছে। কিন্তু হস্টেলে ফিরে এসে কেন যে এত অস্বস্তি বোধ করছিল, কারণ আসার সময় বার বার বলেছে, সাবধানে যেও ডাক্তার। কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল না।

আরও বিস্ময়, কুঠিবাড়ির ফোন নাম্বারও তার কাছে থাকা দরকার। অথচ নেই।

ফোন আছে, সে জানে। তবু লিখে রাখেনি।

ফোনের ঘরটার পাশেই হুকুম সিং শুয়ে থাকে। অবশ্য বাড়িটায় কেউ কখনও ফোন করেছে বলেও জানে না। তার হস্টেলে ফোন আছে বড়দি ছাড়া কাউকেই খবরটা দেয়নি।

অন্তত কুঠিবাড়ির ফোন নাম্বরটা থাকলেও সে জানতে পারত, মনোরমা কী করছে?

সে মনোরমার জন্য এত আকুল কেন তাও আজ বুঝছে না।

আর রাতেই বড়দির ফোন।

কে বলছ?

আমি সতীনাথ।

এটা কি ডক্টরস চামারি হস্টেল!

আজ্ঞে।

সজলকে একটু ডেকে দেবেন।

নীচ থেকেই সতীনাথ চেঁচাল, সজল তোর ফোন। সজল যদি না শুনতে পায়, কারণ ফুল ভলিউমে কারওর ঘরে রেডিও বাজছে। সে সিঁড়ি ধরে দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। এই নির্মল, সজল কোথায়। ওর ফোন আছে।

এই ঘরে নির্মলই সজলের একমাত্র কাছের মানুষ। সজল এখন কোন ঘরে আছে, রাত এগারোটায় ফোন, নির্মলই বলতে পারে কোন ঘরে আছে। সেই বলল, দাঁড়া ডেকে দিচ্ছি। তার পরই বলল, দেখ সুধীরদের ঘরে থাকতে পারে। বিকেল থেকেই বাবুর পাত্তা নেই, এসেও দেখি ঘরে নেই। এই নিয়ে তিন বার ভদ্রমহিলা সজলের খোঁজ করল। ওঁকে বলেছি, দাঁড়ান দেখছি। সে নিজেই উঠে গেল, এই তোর বড়দির ফোন— সজল হাত-পা ছড়িয়ে চোখে বালিশ চাপা দিয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে তক্তপোষে।

তার কথার কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এই, কী হল তোর!

বলছি না, তোর ফোন আছে।

থাকুক।

বার বার ফোন করছেন। কী বলি, না এখনও ফেরেনি। কোথাও বের হয়েছে। এলেই বলে দেব।

কোথায় গেছে।

তা তো জানি না।

দশটা বাজে! ফেরেনি!

আজ্ঞে না।

এলেই কিছু বলবেন, বড়দি ফোন করেছে।

এই কলকাতায় তার ফোন করার বিশেষ কেউ নেই। অবশ্য আজকাল কিছু আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে এসে তার খোঁজ নিচ্ছেন। এবং নিজেদের

আত্মীয় বলে পরিচয় দিচ্ছেন।

তার ডাক্তারি পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই, প্রায়ই তারা হাসপাতালে আসেন।

তুমি বাবা পূর্ণিমার ছেলে।

আজ্ঞে।

আমি তোমার মেসো হই। বেলঘরিয়ার নয়াপল্লীতে থাকি। অনেক দিন থেকেই তোমার মাসিমা অসুখ। ডাক্তার হাসপাতালে দিতে বলছে।

কাল আটটায় নিয়ে আসুন, আউটডোরে দেখিয়ে দেব।

লাইন দিতে হবে তো।

দিতে হবে না। টিকিট করে রাখব। ডাক্তার আগে দেখেছে?

দেখেছে। ফুসফুসের দোষ পেয়েছে।

ঠিক আছে। ভাববেন না। ভাল হয়ে যাবে।

এবং এই হচ্ছে সজল, তার সঙ্গে কথা বললেই মন ভাল হয়ে যায়।

সে কাউকে নিরাশ করে না।

আত্মীয় হলেই সে যে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে তাও না, তার কাছে যারাই আসে, সে তাদেরই যথাসাধ্য সাহায্য করে।

বড়দির বাড়িতে কি বিপদ!

সে হস্টেল থেকে কোথায় যেতে পারে এমনও দুশ্চিন্তায় থাকতে পারেন। বড়দির বাড়িতে সে পাঁচ বছর এক নাগাড়ে থেকেছে, এখনও ছুটিছাটায় বড়দির বাড়িতে গিয়েই ওঠে। তার ঘর, বিছানা, তার দেওয়াল মেঝে কেউ বেশ যত্ন নিয়ে ঝাড় দেয়। বিছানার চাদর ওয়াড় যত্ন নিয়ে কেচে রাখে।

সে গেলে সবাই কৃতার্থ হয়।

একজন তো হয়ই।

তার আবির্ভাবে সুব্রতা দৌড়ে ঘরে চলে যায়।

পিসিমা, সজলদা এসেছেন। চাবিটা দাও।

সে না থাকলে সজলের ঘরে তালা দেওয়া থাকে।

সুব্রতা তালা খুলে জানালা খুলে দেয়, পাট করা সাদা চাদর বিছানায় পেতে দেয়। তার চেয়ার, টেবিল, এবং কিছু বই যা এখনও এই ঘরে পড়ে আছে, সযত্নে মুছে সাজিয়ে রাখে। সুব্রতার চোখে চোখ না পড়ে যায়, চোখ পড়ে গেলেই সুব্রতা ধরা পড়ে যাবে। সুচারু স্নিগ্ধ মেয়েটি তার চোখের সামনে কত বড় হয়ে গেল! এবং কলেজে পড়ছে— তখনই মনে হয় কেন জানি পৃথিবীর বয়স বাড়ছে। ডাক্তারি পড়ার বিষয়টি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ, এবং এই এলাকার মানুষজনও সজল বলতে অজ্ঞান। সুব্রতাও হয়তো ভিতরে ভিতরে তার জন্য গর্ব বোধ করে।

জ্বর ছাড়ছে না।

সজলকে ডাকো।

দাস্তবমি হচ্ছে।

সজলকে ডাকো।

আর সজলও এক লাফে স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে যখন বের হয়ে যেত, বাড়ির মানুষজন তার দিকে গর্বের সঙ্গে তাকাত। মেসোমশাই পর্যন্ত বলতেন মিনতি, তোর চোখ আছে।

সজল নিজেও বড়দির প্রতি কৃতজ্ঞ। বড়দি না থাকলে তাকে কে সাহস দিত, কেন হবে না, ঠিক হবে। এই নম্বরে না হলে কোন নম্বরে হবে। তুমি ভর্তি হয়ে যাও। পরে বাকিটা দেখা যাবে।

এবং কঙ্কাল আর ভিসেরা নিয়েও সুব্রতার অশান্তি তিনি এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

তুই কীরে। তোর কি মনে হয় কঙ্কালটা তোর ঘরে ঢুকে যাবে। স্কুলে যাবি, দু'দিন বাদে কলেজে পড়বি, কঙ্কালটা কি তোকে তাড়া করছে। তার কি প্রাণ আছে!

তা অস্বস্তি হয় গেরস্থ বাড়িতে আস্ত একটা কঙ্কাল তুলে আনলে অস্বস্তি হতেই পারে। একজন প্রায় সাবালিকাকে এ জন্য দোষ দেওয়া যায় না। অশান্তি যখন চরমে, সুব্রতার শেষ কথা, হয় কঙ্কাল থাকবে, না হয় তোমার আদরের ভাই থাকবে, আমি এ বাড়িতে থাকব না। আমি মামাকে ফোন করেছি। ভয় লাগলে চলে যেতে বলেছেন।

সুব্রতা তার উপর তখন নানা কারণেই খেপে ছিল। কী কারণে খবরটা সুব্রতার কানে কে তুলে দিয়েছিল সে জানে না। সুব্রতা চেঁচিয়ে বলেছিল, পিসি পিসিদির তাড়াও তোমার ভাইকে। বাড়ির মানসম্মান আর থাকছে না। আমার বন্ধুদের কী হাসাহাসি। আরে শুনেছিস, তোর সজলদা না কি মিনিবাসে দু'খানা টিকিট কেটেছে!

দু'খানা কাটতেই পারে, এটা হাসার কী হল?

না রে আর কেউ তার সঙ্গে ছিল না। কন্ডাক্টর ত বলল, আর এক জন কই?

আর এক জন কেউ নয়। যাওয়ার সময় টিকিট কাটতে ভুলে গেছিলাম। আপনি দিন, দু'টো টিকিট।

বাসের সব লোক তামাশা দেখছিল, কেউ আবার সিট থেকে উঠে এসে এমন আহম্মক কে আছে, দেখার জন্য ঝুঁকেছিল। এক জন তো বলেই ফেলল। ভাই তোমার দেশ কোথায়। এক জন বলল, দেখি তোমার মুখখানা বাবা।

তোমরাই বল, তিনি ব্রিলিয়ান্ট, তিনি অসাধারণ, তিনি আর দশজনের মতো নয়, তিনি গাঁধী মহারাজ, একটা তামাশার পাত্রকে পিসিমা আর কত তোল্লাই দেবে। মান ইজ্জত বাড়িটায় আর কিছু রইল না।

পিসিমা বলেছিলেন, বেশ করেছে। পয়সা তো দেওয়াই উচিত। যাওয়ার সময় দেয়নি, ফেরার সময় একসঙ্গে দু'টো ভাড়াই দিয়েছে, তাতে দোষের কী হল। তোর বন্ধুদের বলবি, মানুষ মাত্রেই চোরছ্যাঁচড়, বাটপাড়, ধাপ্পাবাজ নয়। ভাল মানুষও আছে পৃথিবীতে। তারা আছে বলেই শত পাপ ধুয়ে যায়, বৃষ্টিপাত হয়, রোদ ওঠে, বাতাস বয়ে যায়। শিশুর জন্ম হয়।

সে তার নিজের ঘরে সে দিন বড়দির তার হয়ে এত কথার জেরে কেমন আপ্লুত হয়ে গেছিল, চোখে জল এসে গেছিল।

বড়দিই কঙ্কালটা নিয়ে তার চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

অবশ্য সজলের মনে হয় মেয়েটার কোনও দোষ নেই। সে নিজে বুঝেছে, আতঙ্কে সুব্রতার রাতে ঘুম হয় না। চোখের নীচে কালি জমেছে। চোখ মুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। ছেলেমানুষ, রাতে ঘর থেকে বের হতেও ভয় পেত। হতেই পারে সে রাতে দুঃস্বপ্নে দেখতে পায় কঙ্কালটা। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে তার শিয়রে উঠে দাঁড়িয়েছে, মাথায় হাত বুলিয়ে যদি বলে, মা সুব্রতা ভাল আছিস। এমন বলতেই পারে, কারণ কঙ্কালটা এক নারীর। সুব্রতার মা নিখোঁজ— কার কপালে কী লেখা থাকে কেউ জানে না। মানুষের অন্তত অহঙ্কার সাজে না।

যেতে হয়, তুমি মামাবাড়ি চলে যাও। বছর খানেক মামাবাড়ি থাকলে তোমার ক্ষতি হবে না। অস্বস্তি আমারও হয়, আসলে সংস্কার, দীর্ঘকাল আমরা যে কুসংস্কার বয়ে চলেছি, কঙ্কালটি তারই জের।

সজল খুবই বিব্রত বোধ করছিল। সুব্রতা তার জন্য মামার কাছে চলে যাবে ভাবতেই খারাপ লাগছিল।

সজল বের হয়ে ভিতর বাড়িতে ঢুকে বলেছিল, পিসিমা আমি বরং একটা কাজ করি।

তোমার আবার কী কাজ!

যা বলছিলাম, কঙ্কালটা যদি নির্মলের কাছে রেখে আসি।

কোথায় থাকে নির্মল।

আমরা একসঙ্গে পড়ি। খুবই ভাল ছেলে।

মেন হস্টেলে থাকে। ওর নিজেরও কঙ্কাল আছে। তার সঙ্গে আর একটা থাকতেই পারে। সে বললেই রাজি হবে। জায়গার অভাব হবে না।

না। তোমার ক্ষতি হবে। শুনেছি, ডাক্তারি বিদ্যায় অ্যানাটমিই সবচেয়ে শক্ত সাবজেক্ট।

বড়দির এক কথা, না। আর শোনো সজল, হয় তুমি আমাকে বড়দি ডাকবে, না হয় পিসিমা। যখন খুশি যা খুশি বলে ডাকবে, আমি সহ্য করব না। আমাকে তোমার তুষ্ট করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

না, না, আপনাকে—

থাম।

সজল কাচুমাচু গলায় বলল, সুব্রতা মামারবাড়ি চলে গেলে যে তারও পড়ার ক্ষতি হবে।

সে আমি বুঝব, সজল। আর শোনো, তুমি আমাকে বড়দি বলেই ডাকবে। দু'মাস তো হয়ে গেল, এখনও ডাকখোঁজে ভুল করলে আমার কিন্তু অপমান বোধ হয়।

সজল খুবই লজ্জায় পড়ে গেছিল সে দিন।

তার পরই প্রশ্ন, সুব্রতার জন্য তোমার এত চিন্তা কেন।

সত্যি মারাত্মক অপরাধ। এক জন প্রায় সাবালিকা হতে যাচ্ছে এমন মেয়ের জন্য যতই আকর্ষণ থাকুক, মামাবাড়ি গেলে সুব্রতার পড়ার ক্ষতি হবে— এখন তার খোলাখুলি বলা উচিত হয়নি—

না মানে।

আর মানে দিয়ে কাজ নেই—

সবই তার মনে পড়ছে।

সেই বড়দি তাকে ফোন করেছে।

সে কী করবে বুঝতে পারছে না। সে দেখেছে, বড়দি তার গতিবিধিও লক্ষ রাখে। তিন বার ফোন করার অর্থ, তাকে না পেয়ে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

ঘ্যালো বড়দি।

আরে তুমি কোথায় থাক।

না মানে...

এই হয়েছে মরণ, কিছু সোজাসুজি না বলতে পারলেই আমতা আমতা শুরু কর। এইমাত্র ফোন করে জানতে পারলাম, তুমি ফিরেছ। গেছিলে কোথায়?

ওই কুঠি বাড়িতে।

কুঠিবাড়ি মানে!

সরকার বাড়ির মাঠের পাশে একটা বিশাল জরাজীর্ণ বাড়ি আছে না, বাইরে কোথাও পলেস্তারা খসা— সামনে সুন্দর একটি ফুলবাগান আছে, বাড়িটার পাশে একটা সুন্দর লনও আছে, তার পর জলাভূমি, কচুরিপানায় ভর্তি—

কী করতে গেছিলে?

সে কী যে বলে। বড়দি তার অভিভাবকের মতো—

পেসেন্ট দেখতে।

ওটা তো হানাবাড়ি। ওখানে পেসেন্ট থাকে কী করে। চার পাশে কোমর সমান উঁচু পাঁচিল আছে, তাই না। এক জন বুড়ো, সারাদিন বারান্দায় বসে কাগজ পড়ে তো।

আজ্ঞে ঠিকই ধরেছেন।

আর শোনা যায় পরির মতো একটি মেয়েকে মাঝেমাঝে দেখা যায়। ঘাঘরা পরে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িটাতে কিছু কাজের লোকও আছে। তবে এত বড় বাড়ি, কে কোথায় থাকে টের পাওয়া যায় না।

কী হয়েছে তোমার পেসেন্টের।

মানসিক অবসাদ।

কার?

এই রে এ বারেই ধরা পড়ে গেল। কী যে বলে!

ঠিক আছে, শোনো তোমার বাবা কাল আসছেন। তিনি আমাদের বাড়িতেই উঠবেন। তুমি যেখানেই থাক, জানাতে বলেছে। কাল বিকালে অতি অবশ্য চলে আসবে।

ঠিক আছে।

না, ঠিক নেই। চিঠিটি দু' হপ্তা আগে পোস্ট করা খামে চিঠি। তিনি তার আসার বিস্তারিত কারণ লিখেছেন—

সে ফের দোনোমোনো গলায় বলল, বাবা তো অন্য কোথাও জলগ্রহণ করেন না। কলকাতায় ম্লেচ্ছদের বাস। তিনি স্বপাকে খান। দেশে গেলে আমাকে বলেছেন, তুমি কোথায় থাক, ডাক্তারি বিদ্যা অধ্যয়ন করা ভাল, তুমি কোথায় কীভাবে আছ, তোমাকে নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। নিজ চোখে না দেখতে পেলে না কি শান্তি পাচ্ছেন না।

সে তো ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু বড়দি, তাঁর নারায়ণ পূজা ফেলে আসবেন কী করে বুঝতে পারছি না।

নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা করে আসছেন।

এ খবর সুখের নয়। কারণ তার পিতাঠাকুর খুবই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। তিনি যে এখানে এলেও স্বপাকে খাবেন এবং বড়দির পরিবারে অজস্র বিভ্রাট তৈরি করবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সে না বলে পারল না, আমি তো বাবাকে কোনও ঠিকানা দিইনি। কারণ বাবার পক্ষে এখানে এসে রাত্রিবাস করাও কঠিন, পূজা আহ্নিক স্তোত্রপাঠই তার জীবনের অঙ্গ। জীবনের শুধু অঙ্গই নয়, এটাই মানুষের প্রকৃত কাজ, এমন ভেবে থাকেন। বার বার নিষেধ করেছি, আসবেন না বাবা, কলকাতা খুবই বড় শহর, আপনার পক্ষে পথ চিনে সঠিক ঠিকানা খুঁজে বের করা খুবই শক্ত। কলকাতায় গিয়ে কোথায় হারিয়ে যাবেন তখন আর আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং আমি গিয়ে এক বার নিয়ে আসব বলে এসেছিলাম। অথচ তিনি আসছেন। হাতে সময়ও নেই যে চলে যাব, কাল সকালের ট্রেনে ছাড়া যাওয়ারও উপায় নেই। কী যে মুশকিলে পড়া গেল।

ও সব তোমাকে ভাবতে হবে না সজল। তোমার বাবাকে আমিই আসতে লিখেছি। শিয়ালদা স্টেশনে নেমে কোথায় বেলেঘাটার বাস পাওয়া যায় তাও লিখে দিয়েছি। কোথায় নামতে হবে, খাল পোল বললেই কনডাক্টর নামিয়ে দেবে। রাস্তার নাম নম্বর সবই লিখে দিয়েছি। এত চিন্তা করার কিছু নেই। আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তিনি আশান্বিত হয়েছেন, কারণ কলকাতায় তাঁর রাত্রিবাসের যে কোনও অসুবিধা হবে না, আমরা নিজেরাও ব্রাহ্মণ পরিবার—

তা বললে চলে। রাঁধুনি কে? মেনকাদি তো দাস না সরকার, সে যাই হোক, তাঁর ছোঁয়া জলও খাবেন না তিনি—

কেন যে—

বাড়িতে কি আর কেউ নেই। সুব্রতা আছে, তার কাকিমা আছেন, প্রয়োজনে আমাকেও না হয় ছুটি নিতে হবে।

এই বাবা মানুষটি কী ধাতুতে গড়া সজল ভালই জানে। একটি শিলাখণ্ডের কী তেজ, তাদের বাড়ি না গেলে বোঝা কঠিন। এই ঘরে গৃহদেবতা থাকেন। স্বয়ং বিষ্ণু এই শিলাখণ্ডে কোথাও জায়গা না পেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, তাঁকে প্রণাম করুন।

ঘর তো না, একটি তালপাতার ছাউনি দেওয়া বাক্সবাড়ি। আর খুঁটি বাঁশের বেড়া। কুকুর বেড়ালের উৎপাতে না পড়ে যান পুণ্ডরীকাক্ষ, তার জন্য বাঁশের একটি দরজা। বাঁশের ঠেকায় ঝাঁপটিকে আটকে রাখা হয়। নিত্য পূজা সারতেই পিতাঠাকুরের বেলা যায়। নারায়ণ যে একটি শিলাখণ্ডে আশ্রয় নিয়ে আছেন সেই বিশ্বাস তাঁর অমোঘ। তার কাছে যা শিলাখণ্ড, পিতাঠাকুরের কাছে তাই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এ হেন পিতাঠাকুরের আসার কথা শুনে কিছুটা বিমর্ষ সজল।

কী যে দরকার পড়ল কলকাতায় আসার সে বুঝতে পারছে না। সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

আর কিছু লিখেছে!

লিখেছে। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা যেমন লেখেন আর কী। লিখেছেন, তুমি গরিব বামুনের পুত্র, তোমার মতিভ্রমের আতঙ্কে তার ভাল ঘুম হয় না। কলকাতা তো ভাল জায়গা নয়।

আসলে সজল গোটা চিঠিটার বয়ানই শুনতে চায়। সে বলল, ও এই।

বড়দি বলল, তোমার একটি বিবাহযোগ্যা বোন আছে, দিন দিন গলার কাঁটা হয়ে উঠছে— একেবারে কালসর্প, তার যদি কোনও পাত্রের খোঁজ থাকে।

তার পর বলল, তোমার মা খুবই মুখরা, ঘরে তিষ্ঠোতে দিচ্ছেন না। এত বড় কালসাপ কেউ ঘরে পোষে! কালসাপ গলায় নিয়ে বোম বোম মহাদেব হয়ে ঘুরছ, গেলে ফিরতে চাও না, রাতে তোমার বাবার নাসিকা গর্জনে ক্ষিপ্ত তোমার মা, বিবাহযোগ্যা তোমার বোনকে পার করা যে কত দরকার তোমার বাবা না কি বুঝতেই চায় না। বুঝলে, রাতে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে পারে।

আসলে সজল জানে, বাবা চিঠি দিয়েছেন বড়দিকে, সেই চিঠি চেয়ে নিয়ে পড়ার ক্ষমতা তার নেই, কারওর ব্যক্তিগত চিঠি কখনওই পড়া তো যায়ই না, পড়া উচিতও নয়। অথচ তার বাবা কী লিখতে কী লিখল, না জানতে পারলে সে শান্তি পাচ্ছে না। বড়দি নিজেই যখন বলছেন— কিন্তু বাবাকে বড়দির চিঠি লেখা কেন— তিনি আসতে না লিখলে বাবার মতো মানুষের পক্ষে রেলে চড়ে এতটা পথ আসা কখনওই সম্ভব না।

এমনকী দরকারি কাজ যে তার বাবা এই সঙ্গেমির অবস্থায় নারায়ণ পূজা ফেলে গৃহত্যাগে উদ্যত হলেন! বোনের পাত্রের খোঁজে যদি সত্যি মা-র চোপা সামলাতে না পেরে গৃহত্যাগে বাধ্য হন তবে বাবাকে দোষও দেওয়া যায় না। এমনও হতে পারে বড়দি বাবার পুত্রটিকে দেখে হয়তো তার পিতাঠাকুরকে দেখার কৌতূহল থেকে নিবৃত্ত হতে পারেননি সে জন্যও চিঠি লিখতে পারেন।

কাল সকালে তার ইমারজেন্সি ডিউটি, তার পর মনোরমার জন্য মন খারাপ, অপরাধবোধে আচ্ছন্ন, বিকালে মনোরমার কাছে যে করেই হোক যাওয়া দরকার, সেও যে তার জন্য অপেক্ষা করবে, না গেলে চোখের জল ফেলবে, কেন যে মনে হয় বড় একা মনোরমা, একা থাকলেই সে না কি সাঁজবেলায় আমলকি গাছটার নীচে গিয়ে বসে থাকে—এবং গায়, 'তোমরা যে বল দিবস রজনী, ভালবাসা ভালবাসা, সখি ভালবাসা কারে কয়', অথবা কখনও তার যেন বিলাপ, আমাকে কেউ বোঝে না, কখনও আবার গায়, 'আর রেখো না আঁধারে'— যার এমন সুমধুর কণ্ঠ— দিন যত যায় নব নব সাজে মনোরমা তার কাছে ধরা দিতে চায়, এবং আজ যা হয়ে গেল—

মনোরমা যেন এত দিনে পূর্ণ বিকশিত। আজ সে কুসুমিত।

কখনও সজলের মনে হয় এটাই তার পুনর্জন্ম। এটাই তার পুনরুত্থান।

মনোরমা তার ওপর খেপে গিয়ে নিজেকে নির্যাতন করে এমনও মনে হল তার। মনোরমাকে কষ্ট দিয়ে সে আর বেশি দূর যেতে পারবে না, কিন্তু হঠাৎ কানে আসা তার ওই গান, 'আর রেখো না আঁধারে'— অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য সে কি পুত্রবতী হতে চায়!

যার ইচ্ছা গান্ধারীর চেয়ে আরও একুশটি পুত্রের অধিক সন্তান প্রসবের, শোণিতের এই সুমধুর সন্ধ্যায় সে এখন পাগলিনী রাধা, কিংবা বীর্যবতী নারী, এক দিনের কথা মনে পড়ে, মনোরমা যে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, বুড়ো হুকা সিংহের সব কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না। আমার মাকে সে খাটো করতে চায়, লোকটার ভীমরতি ধরেছে। উল্টাপাল্টা বকে। তুমি তার কথায় কান দিও না। হুকাদাদুকে যোশীমঠে নির্বাসিত না করলে ওঁর শিক্ষা হবে না দেখছি।

শেষপর্যন্ত ঠিক হল, বড়দি নিজেই স্টেশনে যাবেন।

কারণ সজলের বাবা ধূর্জটিশেখর যদি ট্রেন থেকে নেমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান! সকালবেলায় হাতের কিছু কাজ সেরে এমন মনে হল তাঁর। তা ছাড়া আকাশের অবস্থাও ভাল না। ভোররাতের দিকে কালবৈশাখির ঝড়বৃষ্টিও হয়ে গেছে, সকালের দিকে বেশ ঠান্ডা ভাব এবং বিকালেও যে ঝড়বৃষ্টি হবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। মানুষটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা এ দেশের একজন শরণার্থী। রানাঘাট থেকে নশিপুরে সোজা চলে গেছিলেন। কারণ সেখানে তাঁর গাঁয়ের কিছু মানুষ জমিজমা কিনে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। তারা জানিয়েছে, চলে আসেন কর্তামশায়, একঘর বামুনের খুব দরকার পুজাপার্বণ সব বন্ধ, এ দেশে জমি খুবই শস্তা, প্রচুর শস্য ফলে। চালের মণ চোদ্দো টাকা, শাকসবজিও শস্তা। ফুলকপি, বাঁধাকপির এত ফলন যে, মাঘ ফাল্গুনে গো-খাদ্যে পরিণত হয়। তিনি এ দেশে দর্শনা থেকে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে নশিপুর পর্যন্ত এক বার রেলের যাত্রী হয়েছিলেন। তার পর আর তাঁর ট্রেনে ওঠা হয়নি। নশিপুরকে রেল স্টেশন সংলগ্ন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামই বলা যায়। এমনকী কার্যকারণে তাঁর কখনওই সদর শহরেও যাওয়া হয়নি। থিতু হতে গিয়ে এতই তিনি অস্থির হয়ে আছেন যে, কোথাও গেলে না আবার, এই জমিটুকুও কেউ হরণ করে নেয়। সুতরাং এমন মানুষের পক্ষে কলকাতায় একা আসাই অনুচিত। এ সব কথা সজলই তাঁকে বলেছে।

আসবে আসুক, তবে যতই ঠিকানা দিন, আমি তো বাবাকে চিনি। শেষে না একটা কেলেঙ্কারি হয়।

তবে তুই-ই যা সজল। তোর বাবাকে তো আমরা কেউ চিনি না। ভিড়ের ট্রেনে তাঁকে খুঁজে বের করাও কঠিন হবে।

সকালে আউটডোর, বিকেলে ইমার্জেন্সি ডিউটি, আমার পক্ষে তো যাওয়া মুশকিল বড়দি। আর তাঁর এখনই আসার কী যে এত দরকার পড়ল—

সজল যে বিরক্ত বাবা তার আসছে শুনে, বড়দি তাও টের পেয়েছেন। সকালবেলায় তিনি মেনকাকে দিয়ে ঘরবাড়ি সাফ করিয়েছেন, গঙ্গাজল আনিয়ে রেখেছেন— তাঁর জপতপের জন্য আসন, ঘট, কোশাকুশি— কিছুই বাদ রাখেননি। এক বার তিনি তার বাবা নিশিনাথকে তাড়া লাগিয়েছেন, আপনি এখনও বসে আছেন বাবা। বাজারে যাবেন কখন, এক বার ইনকোয়ারিতে ফোন করতে হবে। কখন গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে, জানতে হবে না!

হেঁসেলে মেনকা ঢুকলে তাঁর যে আহারে বিঘ্ন ঘটবে, সজল তাও জানিয়েছে। ভেবেছেন স্কুল থেকে তার ছুটি নেওয়াই উচিত হবে। রান্না সুব্রতাই করবে। বাঙালি মেয়ে মাত্রেই রান্না জানে, সুব্রতা বড় হয়েছে, কলেজে পড়ে, সবই ঠিক আছে, তবে সংসারী করে তোলাও দরকার। সুব্রতা নিজেই রাজি হয়েছে, রান্নার জন্য কেউ যেন বেশি বেশি না ভাবে। 'কেউ' কথাটারও তাৎপর্য আছে, বড়দিও বোঝেন কাকে কটাক্ষ করে এই সব শব্দ উৎক্ষেপণ।

যা মানুষ তিনি।

সজলকে নিয়ে আবার তুই পড়লি সুব্রতা!

পড়ব না! দেখছ না কত অবজ্ঞা তার।

সুব্রতার আর সেই মারকুটে চেহারাও নেই। সজলের দিকে তাকালে আজকাল তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এমনকী সজলের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েও পড়ে, সজলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে তার জল তেষ্টা পায়।

বলতে গেলে বাড়িটাতে রাজসূয় যজ্ঞেরই আয়োজন চলছে। বিন্দুমাত্র ধূলিমলিন হয়ে থাকুক বাড়িটা কেউ চায় না। একটি রেশম বস্ত্র পরে সুব্রতা জপতপের ঘট থেকে তামার থালা গ্লাস কলতলায় নিজেই মাজছে। যেন যোগভ্রষ্টা এক নারী। তপোবনের ঋষিকুমারী। কারণ তিনি আসছেন— তিনি তো আর কেউ নয় একেবারে সাক্ষাৎ যমদূত।

সকালেই সুব্রতা ফোন করেছিল।

এই শুনছ!

হ্যাঁ, বলো।

তোমার বাবা মাছ মাংস দু'টোই খান তো।

আমার বাবা সবই খান। খাওয়ার কোনও বাছবিচার নেই। বাবার কাছে, অন্ন হচ্ছে শিব। অন্নগ্রহণ হচ্ছে শিবের স্তুতি।

কী বলছ, আবোল তাবোল।

আরে আমার বাবা যা তাই তো বলব। তিনি আসছেন ঠিক, তবে তাঁর খড়মের ঠেলায় তোমাদের জীবন ওষ্ঠাগত হতে পারে।

বাবাকে নিয়ে এ ভাবে কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে না কি! তুমি কী!

আমি যা তাই। বড়দি আমাকে স্টেশনে যেতে বলেছিলেন, অচেনা মানুষ। আরে প্ল্যাটফর্মে নামলেই আর অচেনা থাকবে না, তার খড়মের খটখট শব্দেই সারা প্ল্যাটফর্ম সচকিত হয়ে উঠবে। তাকে চিনতে হয় না, তিনি নিজেই তাঁকে চিনিয়ে দেন। একখানা সাদা উত্তরীয় আর ধুতি— মাথায় লম্বা শিখা।

নিশিনাথ হাতে দু'টো চটের ব্যাগ নিয়ে ভিতরের দিকের বারান্দায় বসে আছেন, কারওর পাত্তা নেই। তিনি কী খেতে পছন্দ করেন, খেতে ভালবাসেন, একেবারে কাঠ বাঙাল বোঝাই যায়, বড়দি এক বার এ দিকটায় এসে যখন দেখল বাবা এখনও বসে আছেন, ব্যাগ হাতে নিয়ে, না বলে পারলেন না, কী হল, আপনি বসে আছেন।

কী কী আনতে হবে বলবে তো!

মাছ ভাল দেখে কিনবেন। বরফের মাছ তিনি খান না।

সুব্রতা কলতলা থেকেই ঝংকার দিয়ে উঠল, কে বলেছে খান না, সবই খান তিনি। দাদু তোমার পছন্দ মতো বাজার করবে। তিনি কি বাড়ির গুরুঠাকুর, না দুর্বাসা মুনি, তার কোপে পড়ে গেলে আমাদের সর্বনাশ হবে! তোমরা যা তটস্থ হয়ে আছো দেখছি! সজলদা তো পাত্তাই দিচ্ছে না।

তুই ফোন করেছিলি!

করব না। তার বাবা আসবে, তারই তো স্টেশনে যাওয়া দরকার।

সুব্রতার কাকিমা বাড়ির কুলকালির শেষ বিন্দু সাফ করে বের হয়ে আসছে। বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বলল, সুব্রতা তোকে কে বলেছে কলতলায় পুজার বাসন নিয়ে বসতে। তেঁতুল নিয়েছিস!

কারণ সুব্রতা জানেই না পুজার বাসন মাজতে তেঁতুল লাগে, জানে না ঠিক না, তবে ফুরফুরে উড়ে বেড়ানো মেয়ে, সংসারের কোথায় কী হচ্ছে খুব ভাল কিছু খবর রাখে না, পড়াশোনা, ক্লাস, সিনেমা, অথবা দাদুর সঙ্গে পিসির সঙ্গে গ্রীষ্মে এবং পুজায় বেড়াতে বের হয়ে যাওয়া, কিন্তু সেই মেয়েকে রিহার্সাল দেবার জন্য বড়দির কড়া নির্দেশ আজ থেকেই লেগে পড়ো, মেনকার মেলা কাজ, পুজার বাসন বের করে নাও, মেনকাকে বলো দেখিয়ে দেবে।

সুব্রতা নিজেই আলমারি থেকে বাসনকোসন সব নামিয়েছে। এ বাড়ির সাধারণ পুজার বাসন বলতে, কিছু ছোট ছোট চাকতির মতো থালা, গ্লাস, একটা কাঠের সিংহাসনে, কালীঘাটের পট, রামকৃষ্ণের ছবি আর লোকনাথ ব্রহ্মচারী বসে আছেন হাঁটু মুড়ে— বাড়িতে নিত্য নারায়ণ পুজার ব্যবস্থা নেই, হয়ও না, অবশ্য বছরে দু'-চার বার বারের পুজা হয়, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হয় এবং বারো মাসে তেরো পার্বণেরও ব্যবস্থা আছে, তবে নারায়ণের নিত্য পুজার ব্যবস্থা এ বাড়িতে নেই।

বামুনের বাড়ি, বাড়িতে নারায়ণ শিলা নেই, নিত্য পুজা হয় না, বামুনের বাড়ি হয় কী করে! ধূর্জটিশেখর এমন প্রশ্ন করতেই পারেন।

বড়দি এবং নিশিনাথ এই নিয়েও চিন্তিত।

তাঁদের কুলশীল নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কীভাবে তার প্রতিষেধক খোঁজা হবে এই নিয়েও নিশিনাথ এবং বড়দির মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। হঠাৎ সজলের পিতাঠাকুরকে আসতে বলে, চালে ভুল হয়ে গেল না তো।

আর সজল যা বলেছে, তাও বেশ চিন্তার বিষয়।

বড়দি, হঠাৎ তাঁকে লিখলেন আসতে, তাঁর সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে হবে না! তিনি না এলে আপনাদের কী কোনও ক্ষতির কারণ আছে!

সজল যদি বুঝে ফেলে সুব্রতাকে তার পাত্রী সাব্যস্ত করে, শ্রীযুক্ত ধূর্জটিশেখরকে এক বার দেখিয়ে দিতে চান, এবং যদি তাঁর পছন্দ হয়, তবে এত কাল এই বাড়িতে রেখে সজলের যে উপকার করেছেন, তার ঋণ কিছুটা শোধ হয়।

কিন্তু সজল যে খাপ্পা হয়ে গেছে, যদিও সজল কখনওই বড়দির পছন্দ অপছন্দের বাইরে যায় না। তবু এই কাজ যেন কিছুটা বাড়াবাড়ির পর্যায়েই পড়ে।

সজল সোজা বলে দিয়েছে, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। হস্টেল ছেড়ে যেতে পারব না। এ সপ্তাহে আমার কোনও ছুটি নেই।

সজলের সঙ্গে ফোনেই কথাবার্তা হয় আজকাল। একমাত্র ছুটির দিনগুলিতে সজল এ বাড়িতে আসে। রাতে থাকে, খায়, সকালে আবার চলে যায়। তার ছুটি নেই, সে আসবে কি আসবে না বড়দি বুঝতে পারছেন না।

সজল, রাগ করিস না ভাই, আমি চিঠিতে সময় এবং সুযোগ মতো আসতে বলেছি, তিনি আজই আসবেন বুঝব কী করে! তুই বাড়িতে না

থাকলে তিনি কী করে বুঝবেন, এখান থেকে তুই ডাক্তারি পড়েছিস। তোর থাকা খুব দরকার। অন্তত রাতে চলে আসিস। তোর বাবার সঙ্গে দেখা করে যাস। তুই জলে পড়ে নেই, তোর থাকার ঘর দেখলে তিনি আশ্বস্ত হতে পারবেন।

বড়দি আর তাঁর বাবা সাড়ে চারটার আগেই শিয়ালদা স্টেশনে চলে গেলেন। লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকেও গেল। গোটা প্ল্যাটফর্ম ভিড়ে থিক থিক করছে, অথচ খড়ম পায়ে কেউ প্ল্যাটফর্মে হেঁটে যাচ্ছে না। বড়দি এবং নিশিনাথ গেটে দাঁড়িয়ে আছেন— কোথায় সেই সুদর্শন প্রৌঢ়, সাদা চুল, কপালে চন্দনের তিলক, যদিও গরমে ঘামে এবং ভিড়ের ঠেলায় কপালে চর্চিত চন্দনের দফারফা হওয়ার কথা, সুতরাং বড়দি ঠিকই করে নিলেন, কপালে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ নাও থাকতে পারে। তবে খড়ম পায়ে কেউ হেঁটে গেলে ঠিক ধরা পড়বে— আপনি সজলের বাবা না। আমি সজলের বড়দি, আর ইনি হচ্ছেন নিশিনাথ, আমার বাবা। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। স্টেশনের বাইরে আছে, কোনও অসুবিধা হবে না। বাড়ি খোঁজারও দরকার নেই— এমনই সব চিন্তা মাথায় কিজ বিজ করছে। যদি চিনে যেতে না পারেন, রাস্তা হারিয়ে ফেলেন, রাস্তা হারিয়ে ফেলেন বলা কি ঠিক হবে। এতে তিনি যদি বিরূপ হন, যাই হোক, হাজার রকমের চিন্তায় বড়দি যে আকুল হচ্ছে বোঝাই যায়।

নিশিনাথ বললেন, কী রে, কই কোথাও খড়মের শব্দ শুনছি না। সুদর্শন প্রৌঢ়, মাথায় পাকা চুল, লম্বা শিখা আছে এমনও তো কাউকে দেখা গেল না। তিনি গেলেন কোথায়।

বড়দি নিশিনাথকে বললেন, তুমি দাঁড়াও, আমি প্ল্যাটফর্মের ভিতরে খুঁজে দেখছি।

কোথায় খুঁজবি। পঙ্গপালের মতো রিফিউজি সারা স্টেশনে ছড়িয়ে আছে, কী নোংরা, ওফ কী দুর্গন্ধ— না তোকে যেতে হবে না।

তুমি একটু দাঁড়াও না; নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, সেখানে যদি গল্প করতে করতে জমে যান, রিফিউজিদের ওই এক দোষ, দেশের মানুষ পেলে আর কথা নেই। আমার ছাত্রীরা কথায় কথায় বলত, বড়দি বাড়িতে কুটুম আইছে, তাদের না কি সব সময় বাড়ি ভর্তি লোক থাকে, দেশ থেকে এসে উঠছে, থাকছে, যে যার জায়গা দেখে চলে যাচ্ছে। বাঙালদের অনেক দোষ। তবে দেশের মানুষের দেখা পেলে আদর আপ্যায়নেরও শেষ থাকে না। বাঙালরা খুবই অতিথি বৎসল হয়।

প্ল্যাটফর্মে হাঁটাই যায় না, নোংরা কাঁথা বালিশে ভর্তি, কোথাও কাঠের ধোঁয়া, এক জন বুড়ো মানুষ থালা সামনে নিয়ে বসে আছে। আরও সব আন্ডাবাচ্চা— একটা করে উনুন, আর হাঁড়ি বসানো, কাঠের আগুন— চোখ জ্বালা করছিল, কিন্তু সজলের বাবাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

এ তো ভারী সর্বনাশের খবর।

স্টেশনেই ফোন তুলে কথা আরম্ভ করলেন বড়দি, আরে সজল, তোর বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা তো আমার হারিয়ে যাবার লোক নন। দেখুন আছে কোথাও।

প্ল্যাটফর্মে পাওয়া গেল না। পরের ট্রেনে যদি আসেন। পরের ট্রেন ক'টায়?

পরের ট্রেন সাড়ে দশটায়। বাবা মরে গেলেও রাতে কলকাতায় নামবেন না। কাল যদি আসে। খড়মের শব্দ পাননি?

না তো।

যদি খড়ম পায়ে না আসে! কেন যে বড়দি আমাকে না বলেকয়ে বাবাকে চিঠি লিখতে গেলেন, আসতে বললেন, ভয়ে ট্রেনেই ওঠেন না। কোথায় না কোথায় নিয়ে নামিয়ে দেবে, রাস্তাঘাটে কলহ যদি বাধিয়ে দেন। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান— ট্রেনের এত ঠেলাঠেলির মধ্যে তাঁর আসা খুবই কঠিন, জাত-অজাতেরও ভয়। জাত গেলে তাঁর ধর্মরক্ষা হয় না।

সজল একদম বাজে কথা বলবি না।

তার পিতাঠাকুরকে বড়দির এত প্রয়োজন কেন, কারণ বালিশের নীচে সুব্রতার চিঠি রাখার অভ্যাস আছে— তোমার ইন্টার্নশিপ কবে শেষ হবে, আমি যে আর পারছি না— তোমার বড়দিও টের পেয়েছে, সারা রাত ছটফট করি, আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারি না, আমাকে ভাল লাগে না তোমার! এক বারও তো ডেকে কথা বলো না— আমার যে কী হয়, তুমি বুঝবে না, আমাকে দেখে তোমার কিছু মনে হয় না! লিখে জানাবে। তোমার দীর্ঘপত্রের আশায় রইলাম। সুব্রতার এই খ্যাপামির জন্য তার কষ্ট হয়, কারণ সেই সুব্রতা আর নেই, তবে বালিশের নীচে চিঠিতে প্রেম নিবেদন করে চিঠি রাখা ঠিক না। কখন কার হাতে পড়ে যাবে!

সে কী লিখবে! ফুল ফুটুক না ফুটুক আমরা তো আছি।

মনোরমা যে তার শরীরের সবটাই দখল করে ফেলেছে। আবার সুব্রতার জন্য তার কষ্ট হয়, বড়ই মায়াবী চোখ।

সে চিঠি লিখত না। কিছুই লিখত না। মনোরমার কথা তো আর বলা যায় না। বালিশের নীচে থেকে সুব্রতার চিঠি নিয়ে রাস্তায় হাসপাতাল যাবার পথে, কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলত।

রোদ্দুরে জোৎস্নায় আমি তোমার সঙ্গে হেঁটে যেতে চাই। ইতি সুব্রতা।

কী সাহস মেয়েটার। সে প্রকৃতই যেন খেপে গেছে। কী জানি, কোনও কারণে যদি সুব্রতার এই সব চিঠি বড়দির হাতে পড়ে, তবে তাঁরও তো দোষ দেওয়া যায় না। দুধ দিয়ে বাড়িতে কালসর্প পোষা হচ্ছে! সজলের আসকারা না থাকলে সুব্রতার পক্ষে কখনও সম্ভব প্রেম নিবেদন করা!

হঠাৎ বাবাকে আসতে লেখায় সজলও কম ফাঁপরে পড়ে নেই।

চার পাঁচ বছর একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকলে মায়াও হয়। মেয়েটার তো বড়দি আর দাদু ছাড়া কেউ নেই। পাঁচ বছর হতে চলল পটুর বয়স। সুব্রতার সঙ্গে পটু রাতে শোয়, বংশের দ্বিতীয় সন্তানটিও সারা বাড়িতে দৌড়ে বেড়ায়, খেলা করে। সংসার বাড়ছে, যতই কলেজে পড়ুক সুব্রতা তার তো দুশ্চিন্তা থেকেই যায়। যার মায়ের খোঁজ নেই, পিতা আত্মঘাতী হয়েছেন, এমন মেয়েকে ঘরে তোলাও তো কঠিন। সজল সবই জানে, কিন্তু সে বোঝে না, তার জন্য সুব্রতা দায়ী হবে কেন!

বাইরের বারান্দায় দোলনাটা আর নেই। কেউ দোল খায় না। কখনও সুব্রতা বিকালে পটুকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়। বাড়িতে থাকলেই দস্যিপনা, কিছু ক্ষণের জন্য পটুর দস্যিপনা থেকে কাকিমাকে রেহাই দিতে পারলে সংসারের কিছুটা অশান্তি কমে। পটুও হয়েছে দুরন্ত, স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে, সুব্রতাই স্কুলে দিয়ে আসে, মেনকা কামাই করলে, কাকিমাকে হেঁসেলেও সে সাহায্য করে। মেয়েটার সবচেয়ে বড় গুণ কোনও কাজেই মুখে রা নেই তেমন। কোনও বিষয়ে, সে ভাল হোক মন্দ হোক বিশেষ সরব হতে পারে না। সেই মেয়েটাকেও এক দিন চোখের জল ফেলতে দেখে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল সে। সুব্রতার চোখের জল দেখে সে বিষণ্ণ হয়ে গেছিল। সুব্রতা কি বুঝতে পারছে, এই সংসারে দিন দিন সে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠছে! একমাত্র নিশিনাথ আর বড়দি ছাড়া তার আপনজন কেউ যে নয়, কী যে করে সজল! বাবা যদি আসেন, এক বাক্যে স্বীকার করবেন, মা তুমি অন্নপূর্ণা! দীর্ঘাঙ্গী নারীর যে বিয়ের বাসনা শরীরে, সুব্রতাকে দেখলেই টের পাবেন। সজলাক্ষী এই নারীর গ্রীবা এবং গ্রীবাভঙ্গিও অসামান্য মাধুর্য তৈরি করতে পারে। গোলাপ ফুলের মতো কোমল অঙ্গ দর্শনে পুত্রের নারী নির্বাচনে রাজিও হয়ে যেতে পারেন।

ইমার্জেন্সি ডিউটিতে কোনও দুর্ঘটনা থাকলেই যত অসুবিধা, ফুরসত কম, দৌড়ঝাঁপ বেশি। না থাকলে স্যালাইন, ডেকাড্রন, না হয় ডেরিফাইলিন, এবং এই সব কাজের মধ্যে সুব্রতা কেন যে সারাক্ষণ মন জুড়ে আছে, সে বুঝতে পারছে না। সুব্রতার জন্য এত মন খারাপ তার আজকাল কেন হয়?

সুব্রতার জন্য এক জন সুন্দর মেধাবী উপার্জনশীল পুরুষের খুবই প্রয়োজন। এই বয়সে নারীর শরীর কতটা অস্থির থাকে পুরুষের সঙ্গ পাবার জন্য মনোরমার তীব্র দাহ কিংবা ঘোর থেকে সে তা অনুমান করতে পারে।

রাতে হস্টেলে ফিরে তার স্নান সারা হতেই কালীপদ এসে বলল, তোর ফোন।

সে ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল, বড়দি ফোন করবেনই— কারণ ধূর্জটিশেখরকে প্ল্যাটফর্মে খুঁজে যখন পাননি, তখন কোথাও তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা সত্যি যদি না পাওয়া যায়, ফোনে খবর একটা থাকবেই।

হ্যাঁ, বলো বড়দি।

তুই কি নিজেকে লায়েক ছোকরা ভাবিস?

রেগে যাচ্ছ কেন বড়দি।

রাগব না! ধুতি, উত্তরীয়, খড়ম কত রকমের কেচ্ছা বাপের নামে চালাচ্ছিলি। তোর জন্যই তো এমন হল!

তিনি কি শেষপর্যন্ত বাড়ি পৌঁছেছেন।

বাড়ি এসে দেখি তিনি আগেই হাজির। তিনি ক্যাম্বিশের জুতো পরে এসেছেন। ফুল হাতা সাদা শার্ট গায়ে।

ওই হল। এসেছেন তো।

খড়ম আর ক্যাম্বিশের জুতো কি এক!

ওই হল।

হল, হল করবি না। তুই তোর বাবার সঙ্গে কথা বল।

দাও। এবং দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সেই বজ্রনিনাদ, কালী কালী। পুত্রের কল্যাণে আশীর্বাদী ফুলের মতো বজ্রনিনাদ উড়ে আসতে লাগল। ফোনে এত জোরে কথা বললে যে কর্ণকুহর প্রকম্পিত হয়, বাবা তো জানেন না— জানা শোভনও নয়। এই প্রথম ফোনে আশীর্বাদ বাণী কালী কালী উচ্চারণ করতে পেরে সবিশেষ ধন্য হয়েছেন, এখন আবার কী বলবেন—

আপনার রাস্তায় কোনও অসুবিধা হয়নি তো, বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধা হয়নি তো।

ধ্রুবেলা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল, তুমি আসছ কখন?

কালে!

গাছের একগাদা বেল, কিছু সজনে ডাঁটা, কুমড়ো ফুল, খেতের পটল, সব ভারী— সঙ্গে ছিল তো, খুব জ্বালিয়েছে।

ইস, আপনি যে কী করেন না বাবা!

আমি কি করি, আমাকে করায়, তোমার মাতৃদেবী— কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণা, পরাৎপরাণাং পরমা ত্বমেব— পরমেশ্বরীর ইচ্ছা পূর্ণ করেছি।

না আর বেশি কথা বলা ঠিক হবে না, তিনি তো যে সে লোক নন, নিত্য নারায়ণ সেবা করেন আর শ্রীশ্রী চণ্ডী পাঠ করেন অন্তরালে, নারী মাত্রেই তার কাছে খড়্গিনী শূলিনী ঘোর গদিনী চক্রিণী তথা। মার তোপার তোড়েই তা হলে খলের মধ্যে— পুত্র সজনে ডাঁটা খেতে ভালবাসে,

নাও সজনে ডাঁটা।

গাছে বেল পেকেছে, নাও গোটা চারেক বেল, পুত্র কুমড়ো ফুল খেতে ভালবাসে, গন্ধরাজ লেবু খেতে ভালবাসে, শত হলেও খেতের পটল, যখন এসেছেন, পুত্রের জন্য খেতের পটল নিয়ে আসতেই হয়।

সে বাধ্য হয়ে বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি কাল যাচ্ছি। বলে যেন ছেড়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ইনিই হচ্ছেন তার পিতাঠাকুর এবং জন্মদাতা।

পিতাঠাকুরের কাছে ইহলোক, মায়াপ্রপঞ্চ।

পরলোক তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতমং শুভং।

পরলোকে অর্থাৎ স্বর্গে এক খণ্ড জমি লাভের জন্য তিনি এত বেশি ধর্মকামী। নিত্য নারায়ণ পুজো সহ বিষ্ণু পুজো, শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীস্তোত্র পাঠ, এবং পরকালের চিন্তায় যে দৌড় শুরু করেছেন তাতে ইহকালও যায়, পরকালও উৎপাটিতকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্ন দর্শন হয়। যার কোনও বীজ নেই, শেকড় নেই, তারই ভজনায় তিনি মুগ্ধ হয়ে আছেন।

পিতাঠাকুর জীবনে এত বেশি ধর্মবিলাসী হওয়ায় তার ক্ষোভ হয়, এবং মাসে মাসে ফের ট্রেনে তুলে দিতে পারলে বেঁচে যায়।

পর দিন সকালেই সে বড়দির বাড়িতে চলে যায়, এবং গিয়ে জানতে পারে তিনি জপতপে বসেছেন।

জপতপ সেরে বের হয়ে এলে প্রণাম সেরে সজল বলল, আপনার নারায়ণ সেবার ক্ষতি করে চলে আসা উচিত হয়নি। তিনি কুপিত হলে যেটুকু আপনার আছে তাও যাবে।

বাবাকে নিয়ে সজলের মুশকিল হল, তিনি অত্যন্ত সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষা ব্যবহার করেন, এবং মা তাঁর অনেক শব্দের অর্থই জানেন না বলে কুপিত হন, তর বাবায় কী কইল রে!

জানি না।

কারণ যে কথাটি তিনি বলেছেন, মা-র পক্ষে খুবই অবাঞ্ছিত প্রয়োগ। যাহা জানা যায় নাই, বা যে জানে নাই— অবিজ্ঞাত নারী বলা তো মূর্খ বলারই সামিল। এক দণ্ডও সে দেখেনি দু'জনে সংসারে শান্তিতে বাস করছেন, সেই সংসারে সুব্রতাকে তুলে নিয়ে গেলে মহা অপরাধ করা হবে।

অবশ্য বড়দি বাবাকে কেন আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সে তার কিছুই জানে না, অনুমান নির্ভর চিন্তার কোনও অর্থ হয় না, সে তার ঘরে চলে যাবার সময়ই বাবা বললেন, খোকা তোমার অন্তর্দর্শন বাঞ্ছনীয়।

বাবা কি মনে করেন, সে এখন লাগাম ছাড়া, মনোরমার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, কারণ মনোরমার জাতকুল গোত্র সমাজ সবই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। সে অরক্ষণা। সে জিপসি মেয়ে। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে যে গুঞ্জন সে হুকুম সিংহের মুখেই হোক, কিংবা এই যে বড়দি, তিনি তো বিশ্বাসই করেন না ওই কুঠিবাড়িতে কেউ থাকে। বাস রাস্তা থেকে— কিছুটা জঙ্গল পার হয়ে খানিকটা দূরে বাড়িটার অবস্থানের জন্য, বাড়িটা হানাবাড়ি মনে হওয়াও স্বাভাবিক।

তখনই বড়দি এসে বললেন, এমন ধার্মিক মানুষের পুত্র তুই ভাবতেই খারাপ লাগে।

সজল বড়দিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। পিতাঠাকুর ইতিমধ্যেই বড়দি, নিশিনাথ কারণ নিশিনাথও তার গলার স্বর শুনে বের হয়ে এসেছেন।

তিনিও বললেন, কী বাপের কী ছেলে!

বাবা তার নিজের ঘরে বসে পঞ্জিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন। সুব্রতা, লুচি মিষ্টির প্লেট হাতে সারা শরীর শাড়িতে ঢেকে বাবার ঘরে ঢুকে গেল। এবং ফেরার সময় বলল, তোমার জলখাবার কি দেব? না পরে খাবে?

বাবা দেশ থেকে আসায় তার এক বার দেখা করা উচিত, আর যা মানুষ, কখন না খটকা শুরু হয়ে যায়, কিন্তু আসার পর বড়দির মতো মমতাময়ীর মুখ এতই কুপাবনা হয়ে গেছে বাবা আসায়, না দেখলে সে বিশ্বাস করতে পারত না। প্রায় যেন একজন মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষের মতো উদয় হয়েছেন তিনি। উদয় না আবির্ভাব বলা উচিত হবে, সে বুঝতে পারছে না।

সে তার নিজের ঘরে ঢুকে শার্ট প্যান্ট খুলে হালকা পায়জামা পরল। স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিল। পাখার হাওয়ায় যেন লু বইছে, সে তার চেয়ারে বসে আছে, এবং বিমনা, বাবা তো বলেন, তিনি মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ দেখতে পান, তার ভিতরে মায়া দর্পণ আছে— সে সবই বাবার আজগুবি চিন্তা মনে করে থাকে— বাড়িতেও সকালবেলায় কিছু যে লোক সমাগম হয়, আর কলোনির ক'টাই বা লোক, তারা প্রয়োজনে বাবার পায়ের কাছে বসে, অনেক পরামর্শই নিয়ে থাকে, বাজারে কেউ মিষ্টির দোকান করবে, কেউ বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী ভেবে পাটের আড়ত করবে, এবং দুরগামী ট্রেনে কারও আসার কথা, নিখোঁজ পুত্রেরও কেউ খবর নিয়ে যায়, তিনি সবই ঠিকঠাক বলে দেন, এবং যাত্রা শুভ কি অশুভ তাও বলে দেন। তাঁর নাকি দৈবী ভাষা আয়ত্তে। এই সবের কারণে তাকে অনেক সময় উপহাসের পাত্রও হতে হয়েছে। তবে যাঁরা বিশ্বাস করেন, যাঁরা ইহলোকের চেয়ে পরলোকের প্রতিই বেশি বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে বাবা প্রায় জগদগুরু শ্রী দুর্গাচিন্তেশ্বর।

সে সব সময় পিতাঠাকুরের এই সব ক্রিয়াকলাপ ভাঁওতাবাজি ভেবে অব্যাপার অধিকারেষু বলে তর্ক করেছে।

তখনই সুব্রতা ঘরে ঢুকল, হাতে জলের গ্লাস, লুচি মিষ্টি, অবিকল্প হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টেবিলে রাখো।

দুপুরে খেয়ে যাবে তো।

দেখি।

সে উঠে বসল। সুব্রতাকে দেখল। নাকে নথ, কানে ইয়ারিং, হাতে চারগাছা করে সোনার চুড়ি, এবং অনুঢ়া মেয়েটির পাটভাঙা শাড়ির আনাচেকানাচে যে মহার্ঘ বাতি জ্বলছে, এবং পিতাঠাকুর আসায় তাকে নানা রকম পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। মুখ বড়ই করুণ, তার নিজেরই কেন জানি লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে চায় না, বাবা আর এক দিনও এখানে থাকেন। সুব্রতাকে আর বিন্দুমাত্র বিরক্ত করেন।

তিনি কবে যাবেন কিছু বলেছেন? লুচির অগ্রভাগ ছিঁড়ে মুখে দেবার সময় সুব্রতার মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্ন করতেই সে বলল, তিনি কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে যাবেন। পিসিমা, দাদু সঙ্গে যাবেন। দাদু সারাক্ষণই মেসোমশাইর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় নিমগ্ন থাকছেন। এই বাড়ি দোষ পেয়েছে, দোষ খণ্ডন করার জন্য দিবারাত্রি চণ্ডীপাঠেরও বন্দোবস্ত হয়েছে। সে শুধু বলল, হয়ে গেল!

বাবা কিছু বলেছেন তোমাকে? খাবার শেষ করে থালাটি ফিরিয়ে দেবার সময় সজল সুব্রতাকে প্রশ্ন না করে পারল না।

আমার মুখ দেখলেন, হাত টেনে করবেখা দেখতে দেখতে এক বার চোখ তুলে তাকালেন, দেখে বললেন, সুব্রতা নামে তোমাকে মানায় না। তোমার এই লাবণ্য তাতে আহত হয়, আমি তোমাকে সুচরিতা বলেই ডাকব। তুমি সিদ্ধিদাত্রী, তুমিই নবদুর্গা। আর কী সব শ্লোক উচ্চারণ করলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

কেন তাঁকে আনালেন বড়দি, কিছু কী শুনেছ?

আমি কিছু জানি না।

ঠিক জান, আমাকে বলছ না।

পিসিমা, দাদু আর মেসোমশাই অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছেন। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রাত জেগে!

মনে হয় কুষ্ঠি ঠিকুজি মেলাচ্ছিলেন।

কার?

তা আমি কী করে জানব।

বিষয়টা তো খুবই গোলমেলে, আমার কিছু ভাল লাগছে না জান?

সজল আর স্থির থাকতে পারল না। বড়দির এত গরজ কেন? পিতাঠাকুরকে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরেও নিয়ে যাবেন, বাড়ির দোষ খণ্ডনের জন্য চণ্ডীপাঠেরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে, যজ্ঞি বাড়ির মতো আহার বিহারে পরিবারটি উৎসবমুখরও কিছুটা, যৌনমিলনে অভিভাবকদেরই হাত, নারী পুরুষ মথিত হবার বয়সে এই পাত্র পাত্রীর ইচ্ছে অনিচ্ছের বিষয়ে যেন কোনও মতামতেরই প্রয়োজন থাকে না। এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন করাও চলে না, নিজের অবস্থান নিয়েই তখন বড় সংকোচ।

সুব্রতার এক জন পুরুষ খুঁজতে গিয়ে বড়দি যদি শেষমেশ তাকেই নির্বাচন করে বসেন, বাবাও রাজি হয়ে যান তবেই সে গেছে।

রতিসুখের সুবাদে মনোরমারও যে যথেষ্ট দাবি আছে তার ওপর, আর মনোরমা আশ্চর্য সুবলহরীর মতো তার চার পাশে ঘিরে থাকে। মনোরমা জানিয়েছে, সরযূপ্রসাদ পিপাসিরই আসবেন, নিলক্ষণ ঠিক নেই তবে আসবেন, আর তিনি না এলেও মনোরমা বিহনে তার বেঁচে থাকাই যে কঠিন। তার মুখে বিষাদ দেখা দিলে, সুব্রতার চোখ সজল হয়ে উঠল। আমাকে তোমার পছন্দ না, সঙ্গেসঙ্গে সুব্রতার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

এই কান্না সজলকে আরও বেশি অস্থির করে তুলল।

বড়দিই সে দিন সজলের ঘরে হাজির।

কী রে সজল তোর বাবা রওনা হয়ে গেলেন, তোর পাত্তা নেই— তোকে তিনি কিছু বলে গেলেন। বলতে গেলে কলকাতায় বড়দিই এখন তার অভিভাবক, তার কিছু বেচাল দেখলে রেগে যান এবং শাসনও করেন।

কী বলবেন—

না বলছিলাম, তিনি তো তোর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে চান। তোকে কিছু বলেননি।

বিয়ে। সজল বলল, চাল নেই চুলো নেই বিয়ে। বাবার পক্ষেই সম্ভব। আমার তো পড়াই শেষ হয়নি।

কেন তুই যে বললি, ইন্টার্নশিপ শেষ হলেই, তুই সরকারি চাকরি পেয়ে যাবি।

পাই আগে। নাও পেতে পারি। তোমরা সবাই মিলে কী আরম্ভ করলে বড়দি।

বড়দি কেমন গুম মেরে গেলেন। ও পাশের ঘরে দরজার আড়ালে যে সুব্রতা দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছে— সুব্রতাই না আবার কী ভাবছে! সে তো কারও মনে কষ্ট দিতে চায় না।

সে বের হবার সময় বলল, দেখি।

ছুটির দিন সকালে সজল আসে, তবে রোজ ছুটির সকালে নয়, মাঝে মাঝে আসে। সে না এলে সুব্রতা কলেজ থেকে তার হস্টেল হয়ে ফিরে আসে। মাঝেমাঝে সুব্রতা তাকে সিনেমা দেখাতেও নিয়ে যায়। গোপনে সুব্রতাকে নিয়ে সিনেমা দেখা সজল পছন্দ করে না। কিন্তু সুব্রতা বলেছে, পিসিমা জানে। দেরি হলেই বলবে, তুই কি সজলের হস্টেলে ঘুরে এলি।

মনোরমাও তাকে ফোন করে আজকাল। সে না গেলে তার অভিমানের গলা পাওয়া যায়। সে কথা দেয়, যাবে। তবু কেন যে এক বিষাদ গড়ে উঠছে সজলের মধ্যে— মনোরমা বোঝেই না, মানসিক ভাবে সে সুস্থ নয়। সে শুধু ডিপ্রেশনের শিকার নয়, রিপ্রেসনেরও। সে যে বন্য আদিমতায় ডুবে গিয়েছিল মনোরমার মধ্যে এবং মাঝেমাঝে কুঠিবাড়ি গেলে সজল সতর্কই থাকে, যদি কোনও কারণে চিত্ত তার অস্থির হয়ে ওঠে, কিংবা মনোরমাই যদি তার সর্বস্ব দেবার জন্য ফের প্রস্তুত হয়, কারণ সজল জানে এই বিধিলিপি খণ্ডন করার বোধ হয় তার শক্তি নেই, নিজেকে দুর্বলই ভাবে, এবং ক্রমে সে অস্থির হয়।

কারণ হানাবাড়ি, পরি এবং পোড়োবাড়ি এই সব শব্দসমূহ মাঝেমাঝে তাকে খুবই পীড়িত করে, খুন অপহরণের আতঙ্কও আছে মনোরমার, তা ছাড়া রক্তের দোষ তো কিছুটা আছেই।

মনোরমার মনস্তত্ত্বও জটিল।

মানসিক অবসাদ সম্পর্কেও সজলের কিছুটা পাঠ আছে— মনঃসমীক্ষণের গোড়ার কথা সে কিছুটা তার পাঠ্য বিষয় থেকেই জানতে পেরেছে, যেমন মানসিক রোগী যদি দু' দণ্ড মন খুলে কথা বলতে পারে, যদি সে বলে তার কী মানসিক কষ্ট, কী তার অসুবিধা তা হলে সে অনেকটা স্বস্তি পায়। মন খুলে কথা বললে সব মানসিক রোগীই কিছুটা ভাল বোধ করে— এ ভাবে দীর্ঘ কাল রোগীর সব কথা যদি বের করে নেওয়া যায় তা হলে বোধহয় তার রোগ সেরে যায়।

যেমন মনোরমা অচেনা লোক দেখলেই ভয় পায়। সে গুটিয়ে থাকে। আর এক বার চেনা হয়ে গেলে তাকে সহজে ছাড়তে চায় না। সজলের প্রতি মনোরমার নির্ভরতা আজ হোক কাল হোক তাকে রোগমুক্ত করবেই।

যেমন স্বপ্নতত্ত্বের কথাই বলা যাক।

মনোরমা সহসা কেন যে এক দিন বলে ফেলল, এটা অবশ্য তার স্বপ্নে দেখা কি না, তা অবশ্য বলেনি, তবে আমলকি গাছটি যে বালিকা সেজে শিশুবয়সে তার সঙ্গে বাড়ির পাশের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, এমন গল্প অনেক বারই সে করেছে। স্বপ্ন-তত্ত্ব মনঃসমীক্ষণের একটি বড় হাতিয়ার। পুরাতন কাল থেকে মানুষ স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করে আসছে— এমনও হতে পারে, আমলকি গাছটির কেউ অনিষ্ট করবে ভেবেই— গাছের তলায় কাউকে দেখলেই আঁতকে উঠত মনোরমা। পরে অবশ্য কথা প্রসঙ্গে জেনেছে, তার দাদাজি, এই গাছটির অঙ্কুরোদ্গমের দিনটি, তার জন্মকাল স্থির করে গেছেন। কাজেই বালিকা বয়সে গাছের হাত ধরে সে বনজঙ্গলে স্বপ্নে ঘুরে বেড়াতেই পারে।

সম্মোহনের সাহায্যেও মনোরোগীর চিকিৎসা করা যায়, তবে এটা পুরাকালে চলত— আধুনিক কালেও যে চলে না, তা নয়। তবে সব রোগীকেই যেহেতু সম্মোহন করা যায় না, সেই হেতু এই চিকিৎসা পদ্ধতি অচল। সজল তার কলেজের পাঠ থেকেই মনঃসমীক্ষণের গোড়ার কথা যেটুকু জেনেছে, তার সাহায্যেও চেষ্টা করতে পারে, কারণ সে মনোরমার একান্ত বিশ্বাসীজন। সে মনোরমার শুধু ভাল চায়।

আর সমীক্ষণের যে তিনটি প্রধান স্তম্ভ তার একটিও বিরোচন অথবা সম্মোহন পদ্ধতিতে নেই। বাল-যৌনতা, অবদমন এবং প্রত্যাবৃত্তি কিছুই নেই। সজল জানে ফ্রয়েডের মতে পাঁচ বছরের শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়। এই ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছন্ন যৌনতা ভিত্তিক।

অবশ্য ফ্রয়েডের যৌনতার পরিধি অনেক বিস্তৃত, কারণ শুধু যৌনস্থানগুলিই যৌনাঙ্গ নয়, পায়ু এবং মুখও যৌনতার পরিধির মধ্যে পড়ে। আর যৌন উপভোগের মৌলিক স্থানগুলিতেই যৌনতা নিবদ্ধ থাকে না। যেমন কল্পনায়ও উত্তরকালে ব্যক্তি যৌন উপভোগ করতে পারে। তেমনি বিপরীত লিঙ্গেই শুধু যৌনতা নিবদ্ধ থাকে না, কল্পনায় সাধারণ জিনিসগুলিও যৌনতা প্রাপ্ত হয়। বিপরীত লিঙ্গের যৌনতা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে, এমন জিনিসও যেমন কলম, ফুল, ফল, যৌনতা প্রাপ্ত হতে পারে। সজল মাঝেমাঝে আজকাল নিজেকেও ব্যাধিগ্রস্ত ভেবে থাকে— সারাদিন মনোরমা ভিন্ন তার মাথায় অন্য কোনও চিন্তা থাকে না।

সজলের এই জন্যেই মনে হয় মনোরমার উত্তরকালের রোগ লক্ষণগুলোর কারণ জানতে হলে শৈশবের সেই মৌল বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলো বুঝতে হবে। সজলের অসুবিধা হচ্ছে মনোরমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন করতে পারেনি। মনোরমা নিজ থেকে না বললে তার জানাও সম্ভব নয়।

তার এও মনে হয় সে এখন থেকে যেটুকু সময় পাবে মনোরমাকে সঙ্গ দেবে।

এই সঙ্গ দেবার বিষয়ে কুঠিবাড়ির কারও বিশেষ অমত নেই। কারণ, মনোরমা মানসিক ভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভাঙচুর শুরু করলে তার সামনে কেউই যেতে পারে না। কারও পক্ষেই তাকে সামলানো অসম্ভব।

একমাত্র সজল যেতে পারে।

ক্ষিপ্ত রোষে কাপ প্লেটের দু' এক টুকরোর আঘাতে সেও আহত হয়েছে, কপাল থেকে তার রক্তও পড়েছে, তার পরই মনোরমা সহসা সেই রক্তপাতে বিমূঢ় হয়ে গেছে, খাটে কিংবা সোফায় দু'-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে, এবং তখন সজলের কাজ শুধু তার মনঃসমীক্ষণে ব্যাপৃত থাকা।

আরে আমার কিছু হয়নি, তোমার কান্নার কী হল! তুমি তো ছুড়ে মারনি, তুমি কাঁদবে কেন। দ্যাখ না, সজল রক্ত মুছে মুখ এগিয়ে দিলেই মনোরমা ভারী লজ্জা পেত।

তার পর নিজে দৌড়ে গিয়ে ডেটলে তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাবার সময় শুধু বলত, আমার কী যে হয়। জান, কাল সারা রাত দেখলাম, একটা ট্রেনের পেছনে কারা যেন আমাকে শেকলে বেঁধে রেখেছে— আর ট্রেনটা ছুটছে। সবাই হাত তুলে নাচানাচি করছে।

সজল মনোরমাকে ভরসা দিত— কুস্বপ্নের কথা দ্বিতীয় বার ভাবতে নেই, বলতে নেই। বলতে হয় প্রাচীন বৃক্ষকে বলতে পার— এতে দোষ খণ্ডন হয়।

তা হলে কী ভাবব?

কেন, তুমি তোমার বাবার সঙ্গে তো রূপকুণ্ড, হেমকুণ্ড, নৈনিতাল, আলমোড়া, খাজুরাহো, রানিখেত কত না জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছ, সেখানকার কোনও দৃশ্যাবলি তুমি মনে করতে পার না! শৈশবের কথাও মনে করতে পার।

শৈশবের কথা বললেই কেন যে মনোরমার মুখ ব্যাজার হয়ে যেত।

চিৎকার করত, ওটাকে বের করে দাও। আমি ওকে খুন করব। কাকে যে ভেবে গালাগাল করত মনোরমা!

আবার শুরু করলে মনোরমা! ঠিক আছে শৈশবের কথা তোমাকে মনে করতে হবে না। তুমি কী ভাবতে ভালবাস বলো।

আমার খুব ইচ্ছে হয় বরফ সরোবরের পাড়ে তোমাকে নিয়ে যাই।

সেটা কোথায়? সে তো খুব ভাল কথা।

যোশীমঠ-বদ্রির পথে পড়ে।

তুমি গেছ সেখানে।

যাব না কেন, ওখানে আমাদের গুরুদেব থাকেন।

জায়গাটা কোথায় সজল জানে না। সে তার ঘরবাড়ি থেকে দূরবর্তী স্থান বলতে এই কলকাতায় চলে এসেছে। কলকাতারও বিশেষ কোনও জায়গা তার চেনা নয়। কলেজ থেকে বের হলে কলেজ স্ট্রিট আর তার ফুটপাথ, আর মানুষজনের ভিড়, ট্রামগাড়ি, দোতলা বাস এই সব দেখতে দেখতে তার নানা বিস্ময় খেলা করে বেড়িয়েছে মনে। সে এখনও চিড়িয়াখানা জাদুঘর দেখেনি। হাওড়ার পুল অবশ্য দেখেছে—তার কাছে বিস্ময় সেই বেতড়ের বাঁশবন আর মাঝেমাঝে পরিত্যক্ত পুরনো বাড়ি, কিংবা পাড়া, পুকুর জলা আর জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন স্যাঁতলা ধরা কোঠাবাড়ি, সামনে প্ল্যাটফর্মের মতো দোতলা লম্বা ঘর তাতে সারি সারি ব্যান্ডেজের কাপড় বোনার তাঁত, সামনে মাঠ, সবুজ ঘাসে ঢাকা—সেই স্মৃতি যে-কোনও কারণেই হোক তাকে এখনও হন্ট করে। উদ্ধব দাস, নেপাল, গোপাল, মেধা, কেউ সমবয়সি, কেউ বেশি বয়সি, হাসিঠাট্টা, রঙ্গতামাশা—এবং মাঠের চালাঘরে রান্না, পদ্মপাতায় অথবা শালপাতায় আহার। মন খারাপ হলে সেই বেতড়ের এলাকাতেই যে জীবনের প্রথম কলকাতা দর্শন ঘটেছিল—এমন ভাবতে তার ভাল লাগে। কলকাতায়, মনোরমা তার জীবনের আশ্চর্য আবিষ্কার। বরফের সরোবর আছে হেমকুণ্ডে সে খবর মনোরমাই তাকে প্রথম দিয়েছে।

বরফের সরোবরের পাহাড়, সে আর মনোরমা হেঁটে বেড়াবে, কী দারুণ মজা, সে বরফের সরোবর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না।

আমি ঠিক হেমকুণ্ডে তোমাকে নিয়ে যাব মনোরমা।

হেমকুণ্ডে না।

এই যে বললে হেমকুণ্ডে।

দুস তুমি যে কী না। কোথায় হেমকুণ্ড আর কোথায় হেমকুণ্ড সাহিব। হেমকুণ্ডে কোনও বরফের সরোবর নেই। আমি হেমকুণ্ড সাহিবের কথা বলছি। জান তো খুবই দুর্গম রাস্তা, পাহাড়ের সানুদেশ ধরে যেতে হয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে গেছি। কী প্রবল ঠান্ডা বাতাস। কোথাও খাড়া পাহাড়—আর পাইনের বন, ধূসর নীলবর্ণের এক মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ঢুকে যেতে হয়। আকাশে বর্শা ফলকের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বরফের পাহাড় শৃঙ্গ।

জান তো হেমকুণ্ড সাহিবে গেলে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সও দেখতে পাবে। অত্যধিক শীত আর উচ্চতা হেতু যাত্রীদের খুব সাবধানে চলতে হয়। সে কী শীত, কী শীত!

আসলে একাত্ম হওয়ার জন্য সজল নিজেও মাঝেমাঝে শীতে কাতর এমন অভিনয় করলে মনোরমা বালিকার মতো খুশি হয়ে উঠত।

আরে তুমি শীতে কাঁপছ কেন ডাক্তার!

বললে, ওফ কী শীত কী শীত বললে যে।

ঠাট্টা হচ্ছে না।

না, না, বরফের সরোবরে গেলে শীত তো করবেই। তোমার শীত করলে আমারও শীত করবে তাই না!

শোনোই না ডাক্তার।

শুনছি তো।

শুনছ, না মজা করছ!

তখনই সজল গম্ভীর হয়ে যেত।

তোমার সঙ্গে আমি মজা করতে পারি মনোরমা।

শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহিবের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহজি পূর্বজন্মে কী ছিলেন বলো তো।

গোবিন্দ সিংহজি পূর্বজন্মে কী ছিলেন জানি না, তবে তুমি বরফ সরোবরের সারসী ছিলে, এটা বলতে পারি।

—আবার ঠাট্টা হচ্ছে!

ঠাট্টা না। কী করে জানব। আমি কি তোমার মতো পড়াশোনা করেছি। পাঠ্যবই ছাড়া অন্য বইয়ের পাতা খোলারই সুযোগ পাইনি।

আর মনোরমার তখন আনন্দে কী উচ্ছ্বাস! ডাক্তার তার গুরুত্ব বোঝে।

পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন, মেধস মুনি, ডাক্তার। বরফাবৃত সপ্তশৃঙ্গে ঘেরা নীল সবুজ জলের সরোবর তীরে তপস্যা করেন তিনি। এবং তপস্যায় তিনি দৈবাদেশ পান, খালসা ধর্ম প্রচারের। সে না কি এই হেমকুণ্ডে। দু' কিলোমিটার পরিবেষ্টিত হেমকুণ্ড লেক। লেকের পাড়ে কুটিরও চোখে পড়ে। হেমকুণ্ডের গুরুদ্বারাও বিখ্যাত। আর ঠিক তার পাশেই হিন্দুতীর্থ লক্ষ্মণ মন্দির। জান তো ত্রেতাযুগে ইন্দ্রজিৎ বধের পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য শ্রীরামের ভাই লক্ষ্মণ তপস্যা করেন সেখানে। মন্দিরে সব কালো পাথরের দেবতা—আর সামনে হ্রদের জলে অজস্র বরফের চাঁই ভেসে বেড়াচ্ছে। দূরে অদূরে সব পাইন গাছের সারি—এমন নয়ন জুড়ানো দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

একনাগাড়ে বলে মনোরমা সহসা চুপ করে যায়—মনোরমার স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে সে আশ্বস্ত হয়।

সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জানতে চায়, তার পর।

তার পর অদূরে আমাদের গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। জান তো লক্ষ্মণ-গঙ্গা নদীর উৎসও হেমকুণ্ড সাহিব, ইচ্ছা করলে কোনও ধর্মশালায় রাস্তায় বিশ্রাম নেওয়া যায়। চায়ের দোকানও পড়ে।

তাই বুঝি।

এতেই অবাক হচ্ছ ডাক্তার, আরও যা আছে না।

কী আছে?

আছে ডাক্তার। আমি তোমাকে এক দিন সেখানে নিয়ে যাবই।

আমি, না তুমি? কে কাকে নিয়ে যাবে বলো মনোরমা।

সে হলেই হল, কেউ এক জন নিয়ে গেলেই হল। দেখবে পথের দু' পাশে কত শুভ্র ব্রহ্মকমল ফুটে আছে—আর তার ঘ্রাণ, তুলনা নেই—ঘ্রাণে আমোদিত হয়ে থাকে সারা আকাশ বাতাস। ফুলের সৌরভে কী যে, কী যে মাধুর্য—

ঠিক তোমার মতো।

না, আমার ভাল্লাগে না। ব্রহ্মকমলের সৌরভ আমার গায়ে পাবে কী করে?

আমি পাই মনোরমা।

আর তখনই তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। সে কেঁদে ফেলে। সত্যি পাও ডাক্তার!

সত্যি পাই। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

এ ভাবেই মনোরমা ধীরে ধীরে সজলের কাছে ধরা দিতে থাকে।

এক দিন নিজেই বলল, সরযূপ্রসাদের কী যে দরকার, বাবুজিই কেন যে সরযূপ্রসাদকে বারণ করছেন না, আবার মামলা করে কী হবে, বল ডাক্তার, আমার তো কিছু লাগে না। বিমাতার সম্পত্তির লোভে মাথা খারাপ না হলে অপহরণের কথা কেউ ভাবে, খুনের কথা কেউ ভাবে! সরিয়ে দিতে পারলেই সব তাঁর মুঠোয়।

তার পরই এক দিন বলল, আমার মা জান ডাক্তার ওলাওঠায় মারা যায়। তখন হুকুম সিংহই মাকে জঙ্গলে দাহ করার ব্যবস্থা করে। তুমি তো জঙ্গলটায় কোনও দিন ঢোকোনি।

না। সজল বুঝে পায় না, হুকুম সিংহ তাকে কেন মিথ্যে খবর দিতে গেল! তার মা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।

চলো না, এক দিন দু'জনে ঘুরে দেখব।

তুমি দ্যাখ না ঘুরে, বাড়ির পাশেই তো।

আমার তো একা কোথাও যেতে ভাল লাগে না ডাক্তার।

আবার গোলমাল হচ্ছে কথাবার্তায়।

এই তো সে দিন হুকুম সিংহ ফোন করল, রাত ন'টার সময়।—ডাক্তার সাহেব।

কী ব্যাপার!

রুমালি কি আপনার ওখানে গেছে?

না তো।

বাড়িতে নেই। কচুরিপানার জলার ধারেও নেই। আমলকি গাছের নীচেও নেই—কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

মনোরমার এটাও স্বভাব রেগে গেলে কারওর ওপর অভিমান হলে ঘর থেকে না বলে না কয়ে বের হয়ে যায়। কোথায় গেল!

সঙ্গেসঙ্গে কুঠিবাড়ি গিয়ে তার কেন যে মনে হয়, মনোরমা তার চেনাজানা জায়গা ছেড়ে বেশি দূরে যেতে পারে না। যদি সেই তালবাগানে যায়, সেখানে এখনও বড় বড় ঢিবি আছে মাটির, কোথাও ইতস্তত তালগাছও আছে—যদি সেখানে চলে যায়। এ দিকটায় মানুষজনের ভিড় বেড়েছে, মেলা বাড়িঘরও হয়েছে, তবে সেই তালবাগানের ঢিবিতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার পর সে বাধ্য হয়ে আমলকি গাছ পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে টর্চ হাতে ঢুকে গেল। সঙ্গে হুকুম সিংহ, দুখপ্রসাদ, টুকিপিসি। এত ডাকাডাকি তবু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

সজল কখনও এই জঙ্গলটায় ঢোকেনি বলে জানে না, এত সব বড় বড় বৃক্ষ আছে, লতাগুল্মে ঢাকা ঝোপ জঙ্গল আছে, খুব ছোটও নয় জায়গাটা, ও পাশের রাস্তায় গিয়ে ঠেকেছে। এবং আরও এগিয়ে গেলে খালপাড়ে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে।

সজল ফের ডাকল, মনোরমা তুমি কোথায়? হুকুম সিংহের দিকে টর্চ

জেরে বলল, মনোরমার মাকে কোথায় দাহ করেছিলেন? ও দিকটায় দেখলে হত।

হুকুম সিং আমতা আমতা করছে, সে আশাই করেনি কমালি এতটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যাবে তার।

সজল জানে, কমালি যত অস্বাভাবিক আচরণ করবে, তত তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের গুরুত্ব বাড়বে। কমালিকে যে কেউ এই অবস্থায় ফুসলিয়ে ভাগিয়ে তুলে নিয়ে যেতে পারে— বাবুজি থেকে সরযূপ্রসাদ সবার বিশ্বাস হুকুম সিং, দুখরাম, টুকিপিসি ছাড়া কমালির সুরক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন হবে তারা এত জানেন, কমালিকে আর বোধহয় এখানে বেশি দিন রাখাও যাবে না, হুকুম সিং এক দিন বলেছিল, মামলার রায় বের হলে বাবুজি কী স্থির করবেন কে জানে। এবং এ সব কারণে মনোরমা যতই তার কাছের হোক, কুঠিবাড়ির পরিস্থিতি খুব একটা যে ভাল না, সে টের পায়।

আর তখনই জঙ্গলে টর্চ জ্বালাতেই দেখল, মনোরমা ফের সেই জিপসি পোশাকে একটা বড় বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে আছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

এই এই, মনোরমা তুমি এখানে কেন?

মনোরমার মুখে টর্চের আলো পড়তেই হকচকিয়ে গেল।

আবার ওই নোংরা পোশাক পরেছ।

কারণ কেন জানি তার মধ্যে ফের সেই আদিম বন্য গন্ধ, সে নিজেকে এখনও জিপসি কন্যা ভেবে থাকে— মুক্ত আকাশ, দিগন্তের মাঠ, নদী, পাহাড় অতিক্রম করে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবে বলে ফের বের হয়ে এই জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে আছে।

সে প্রায় ধমকই দিল, ওঠো। সবাই আমরা তোমাকে খুঁজছি, আর তুমি গাছে হেলান দিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়েছ।

মনোরমা বলল, আমার কী দোষ। তুমি যে বললে, মন খারাপ করলে গাছের সঙ্গে কথা বলবে। গাছের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজকাল ছুটি থাকলে মাঝেমাঝে বড়দিকে সজল মুখ দেখিয়ে আসে এই পর্যন্ত। সুব্রতাকে সে অবহেলা করতে পারে না, কিন্তু সেই কুঠিবাড়ির কথা আর ঘুণাক্ষরেও বড়দিকে সে বলেনি, কারণ কুঠিবাড়ির কথা বললেই বড়দি শুধু না, বাড়ির সবাই কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কী দরকার, বড়দির পরিবারে কোনও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, তার চেয়ে ছুটিছাটায় বেশি না যাওয়াটাই তার কাছে বেশি শ্রেয়— মনোরমাকে দেখলে কেন যে এক আঁধার পেরিয়ে জ্যোৎস্নায় কোনও জলছবির মতো মনে হয়। তার জীবনের অতীত রহস্য কিংবা অনুরাধা মাজরীর সঙ্গে বিপুল সম্পত্তির অধিকার নিয়ে যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে, সবই কেমন অর্থহীন মনে হয় তাঁর কাছে। এই শত্রুতাই যে মনোরমার মধ্যে নানাবিধ মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে, এমনও মনে হয় সজলের।

অথচ কুঠিবাড়িতে গেলেই তার প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

যত দিন যাচ্ছে, তত মনোরমার গুণাবলী যেন বিকশিত হচ্ছে।

যেমন এক দিন রেকর্ড প্লেয়ারে মিউজিক বেজে উঠল। একেবারে ঢেউ খেলানো মিউজিক। কী, শুনছ ডাক্তার।

কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তখন তাকে পাশের সোফায় নিমগ্ন হয়ে বসে থাকতে হবে। নড়াচড়া করলেই যেন সঙ্গীতের মাধুরী বেসুরো ঠেকবে মনোরমার কাছে। এবং গানের মাধুর্য তার গলায় গুনগুন করে ক্রিয়া করলে সে শুধু মনোরমাকে দেখে।

মনোরমা আশ্চর্য মেলডি তৈরি করতে পারে বেহালা বাজিয়ে। সে নিভৃতে এই সব বাজায়। চার পাশের গাছপালা এবং পাখি সকলকে এই সব সুরলহরী শুনিয়ে সে যেন মুগ্ধ থাকতে চায়। তখন মনেই হয় না মেয়েটার মধ্যে কোনও মানসিক ব্যাধি লুকিয়ে থাকে। কখনও কোনও অপরিচিত জিপসিরা কুঠিবাড়িতে ঢুকে গেলে সজল টের পায় সব গাছপালা বৃক্ষ সঙ্গীতের মাধুর্যে উথালপাথাল। কোনও অতি বিলাসী বাদ্যবাজনায় কুঠিবাড়িকে মুখরিত করে তোলে জিপসিরা। এবং তার বনজঙ্গল, যদি জ্যোৎস্না থাকে আমলকি গাছটা হাওয়ায় ডালপালা নেড়ে আন্দোলিত হলে কোনও অশরীরী আত্মার ক্রিয়া এমন মনে হতেই পারে।

এই সবের মধ্যেই হঠাৎ কী হল কে জানে এক দিন মনোরমার সেই আর্তি, ডাক্তার আমি যাব তোমার সঙ্গে।

কোথায়?

যেখানে তুমি থাক। তোমার হস্টেলে।

না নিয়ে গেলে মনোরমা ভায়োলেন্ট হয়ে পড়তে পারে। সে যে কি করে। আমার ওখানে যাবে কেন, আজ না গেলে হয় না।

না।

হয়ে গেল। সুব্রতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাকে অবিশ্বাস করতে পারে।

হুকুম সিং ঘরে ঢুকে বলল, দিয়ে যান। একটু ঘুরে এলে দিদিমণির মনটা ভাল হবে। দিদিমণির সঙ্গে কার কী কথা হয়, হুকুম সিং বোধহয় কান পেতে শোনে।

এবং সবটাই কেমন তুড়ুকে ব্যাপার। হুকুম সিং বলল, গাড়ি আসছে।

সজলের চোখ ছানাবড়া। কারণ এ বাড়িতে সে কখনও গাড়ি আছে বলে জানে না। দেখেওনি।

একটি কালো রঙের মার্সিডিজ গাড়িবারান্দায় হাজির। তার ড্রাইভার সাদা পোশাকে, মাথায় সাদা গাঁধী টুপি এবং অত্যন্ত বিনয়ী, এবং দামি শাড়ি সায়া ব্লাউজে মনোরমা নেমে এল কিছুটা অপ্সরার মতো। টুকিপিসি বারান্দা পর্যন্ত এল। দুখরাম এবং হুকুম সিং উঠে দাঁড়াল, সিঁড়ি ধরে নামল, তার পর ড্রাইভার মহাবীরকে বলল, দিদিমণি ঘুরতে যাচ্ছে সাহেবের সঙ্গে। সেই থেকে কখনও কখনও একাই চলে আসে মনোরমা। রাস্তায় গাড়ি ছেড়ে দেয়। চামারি হস্টেলের সিঁড়ি ধরে সহজেই দোতলায় উঠে যেতে পারে। ফোন করে জেনে নেয়, সে হস্টেলে আছে কি নেই। অথবা আজকাল তার ডিউটি চার্টও মনোরমার মুখস্থ হয়ে গেছে। সে কুঠিবাড়িতে না গেলে, কেন গেল না, রাস্তায় কি কোনও গন্ডগোল আছে, কিংবা কোনও ইমার্জেন্সি ডিউটি যদি পড়ে থাকে, নানা কৈফিয়তে তাকে জেরবার করে দেয়। আর সুব্রতা যদি আসে সেও ফোন করে আসে। ফলে সুব্রতার সঙ্গে হস্টেলেই এক দিন দেখা হয়ে গেল মনোরমার। মনোরমা একটা কথাও বলল না।

যেমন কিছু আকস্মিক ঘটনাও ঘটে গেল এক দিন। মনোরমা কুঠিবাড়ির একটা বিশাল হলঘরে তাকে নিয়ে ঢুকে বলল, এস।

কোথায়।

কেন দেখতে পাচ্ছ না।

হঠাৎ ঢুকে চোখে সব কিছু অন্ধকার দেখায়। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না। কোনও ঘরেই জোরালো আলো থাকে না। এই হল ঘরটায়ও নেই। মানসিক অবসাদের জন্য মনোরমা জোরালো আলো সহ্য করতে নাই পারে। এক বিশাল তৈলচিত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে মনোরমা বলল, আমার মা কুমরি দেবী। রাজস্থানি মেয়েদের মতো আশ্চর্য সুন্দরী। পরনে রংবেরঙের ঘাঘরা, কনুই পর্যন্ত চুড়ি, গলায় বিভিন্ন মুদ্রা দিয়ে তৈরি হার। মাথার সিঁথিতে একটা যেন সোনার পুঁটুলি। কোমরে কারুকার্য করা কোমরবন্ধনী। এবং হাতে পায়ে উল্কি।

মনোরমা অপলক তাকিয়ে থাকল।

সজলও অপলক দেখল। মাথা সমান উঁচু তৈলচিত্রে কুমরিদেবী দাঁড়িয়ে নেই। যেন সেখানে মনোরমা সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে।

মনোরমা তার মাকে দেখতে দেখতে বলল, জান, মা বলতেন জিপসি মেয়েদের জীবন মোমবাতি নয়। মোমবাতির শিখা। শুধু জ্বলে। যত ক্ষণ জ্বলবে তত ক্ষণই তার রূপ রস এবং গন্ধ।

তার পরই থেমে মনোরমা বলল, জিপসিরা খুব গরিব জান। তাদের ঘরে আরশি পর্যন্ত নেই। তবু শহরে গঞ্জে সওদা করতে বের হলে বোঝে তারা শহরের সেরা সুন্দরী।

সজল বলল, কী করে বোঝে!

কেন, শহরের পুরুষরা যে তাকিয়ে থাকে। জিপসি মেয়েদের দেখে তাদের চোখে আগুন জ্বলে। ঘরবাড়ি ফেলে তারা জিপসি সুন্দরীর সঙ্গে পালাতে ভালবাসে।

তার পরই সেই আকস্মিক প্রশ্নটি। তোমার ঘরে সেই মেয়েটা আবার এসেছে কেন!

সর্বনাশ। সজল জানে সুব্রতা তার সিটে বসে অপেক্ষা করছিল। তার যে আসার কথা ছিল, খেয়ালই নেই। নির্মলের সঙ্গে গল্পে মজে গেছে রক্ষা, কারণ বড়দি তার সঙ্গে এক দিন নির্মলকেও নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন। নির্মলের সঙ্গে সুব্রতার আলাপ থাকায়, সে না থাকলেও তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার পিতাঠাকুর তো এই মেয়েটিকেই তার বাগদত্তা হিসাবে নির্বাচিত করে গেছেন। আর সবচেয়ে মুশকিল সজলের জিভের ডগায় তার নিজে চিন্তাভাবনা কেমন জড়িয়ে যায়। বানিয়ে কিছু বলতে পারে না।

ও সুব্রতা। চলো, বলে মনোরমাকে নিয়ে একেবারে অ্যাবাউট টার্ন এবং সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে বলল, কাল আমি কুঠিবাড়ি যাব। সরযূপ্রসাদ আসছেন কেন।

আমাকে নিতে আসছেন।

তোমাকে।

আমাকে।

কোথায় নিয়ে যাবেন!

যোশীমঠে।

কেন?

বাবুজি আমার মঙ্গলের জন্য গিরিগোবর্ধন মন্দিরে পুজাপাঠের আয়োজন করেছেন। অলকানন্দায় মৌনি স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে। তার পর সর্বজয়াব্রত ধনাকাঙ্ক্ষিব্রতের সঙ্গে পুণ্য রামনবমী উৎসব পালন করা হবে।

যোশীমঠ। সে তো অনেক দূর। তা হলে আর তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

ঠিক দেখা হবে। চলো তো।

মনটা সজলের খারাপই হয়ে গেল। তার উচিতই হয়নি লেপ্টে যাওয়া এ ভাবে। আর সজল তো বোঝে, সে থাকলে, মনোরমা উজ্জ্বল উজ্জ্বল এবং নবীনা।

মনোরমার কোনও দুঃখ থাকে না। সজল থাকলে মনোরমা যেন প্রাণ ফিরে পায়।

তার কোনও মানসিক অবসাদ থাকে না।

সে তখন খুবই স্বাভাবিক। মদন পাণ্ডে যখন এখানে মনোরমার অসুখের সময় ছিলেন, তাকে তিনি পছন্দই করতেন। রাতে ডিনারেরও আমন্ত্রণ থাকত। মনোরমা নিজে দেখে শুনে সবারই পাতে খাবার তুলে দিত।

এবং সজলের মনে হল, বাড়ির সব খবরই বাবুজির কাছে পৌঁছে যায়। মনোরমা যে বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে চামারি হস্টেলে আসে, সে খবরও বোধহয় তিনি জানেন।

তবে গুরুদেবটি কেমন হবে সজল জানে না। যোশীমঠে নিয়ে গিয়ে যদি শয্যা করার ব্যবস্থা করে, করাতেই পারে, মনোরমার শরীর এখন আশ্চর্য লাবণ্যে ভরপুর, তার হাত পা কোমল পদ্মের মতো নরম, সজল সহজেই তাকে উপভোগও করতে পারে, কিন্তু কেন যে মনে হয়েছে, উপভোগ করার অর্থই সামাজিক ভাবে তাকে নষ্ট করে দেওয়া। এক জন গরিব এবং ধার্মিক পিতার সন্তানের পক্ষে এমন কুরুচি চিন্তা শোভা পায় না। কারণ কুরুচি চিন্তায় ভিতরে অপরাধ বোধ তৈরি হয়। আদিম গন্ধের নেশায় তারা দু'জনেই যে দু'জনকে এক রাতে আকণ্ঠ পান করছে, মনোরমা বোধহয় কোনও বিস্মরণে ভুলে গেছে সব।

গঙ্গার ধারে মনোরমা গাড়ি থেকে নেমে গেল।

নদীর পাড়ে বসে থাকতে ভালবাসে মনোরমা।

সেও পাশে বসে থাকে। নদীর জল, জাহাজ, স্টিমার, গাধাবোট ভেসে যেতে থাকে, ও পারে নারকেল গাছের ছায়ায় কত ঘরবাড়ি, কলের চিমনি। সূর্যাস্তে সেই সব বাড়িঘর দেখতে দেখতে সজল খুবই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনোরমা ইচ্ছে করলে পালাতেও পারে— তবে তার মনে হয়, চার পাশ থেকে পাহারা থাকায় পালানো খুব সহজ কাজ না। আর এও মনে হয়েছে, মনোরমার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কিংবা বোধ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়। সে সজলের মধ্যে তার সর্বস্ব আবিষ্কার করে করে থেকেই যেন মুগ্ধ হয়ে আছে। নির্ভরতা বলতেও সজল। আবার এও মনে হয়, জিপসি রক্ত তার শরীরে প্রবাহিত, সে নিজের ভিতরই এক ভ্রাম্যমাণ নারী। সে নিজে পালিয়ে না গেলে তাকে নিয়ে পালানো কঠিন।

সজল জানে, প্রেম বিয়ে এবং পারিবারিক জীবনে জিপসিরা অত্যন্ত গোঁড়া। ভারতীয় সমাজের মতোই এ সব বিষয়ে তাদের মধ্যে নানা নিয়ন্ত্রণ, নানা বিধির কড়াকড়ি।

মনোরমা ওকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, এই সজল তুমি কথা বলছ না কেন। কী দেখছ!

সজল টের পেল এক আজগুবি ভাবনায় সে তলিয়ে যাচ্ছে— অথচ এই ভাবনার কোনও অস্তিত্বই নেই মনোরমার মধ্যে। সে এখন বাবুজির একমাত্র কন্যা। তাকে জিপসি কন্যা ভাবাই ভুল।

মনোরমা বলল, দ্যাখ দ্যাখ কী সুন্দর সব পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর ও পারে।

সজল উড়ে যাওয়া পাখি দেখল।

জান, ডাক্তার কুঠিবাড়িতে আমার বড় দমবন্ধ হয়ে আসে। জান, পাখিদের মতো দূরে দূরে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সমুদ্রগামী একটা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে মোহনার দিকে— কিছু মানুষ নদীতে ভেসে যাচ্ছে নৌকায়। ও পারে নদীর পাড়ে লঞ্চ ভিড়ছে। মনোরমা পাশের টি-স্টল থেকে দু' কাপ চা এনে বলল, ধরো। তার পর এক কাপ সজলকে দিয়ে নিজে নিল এক কাপ। নদীর জল দেখতে দেখতে চা খেতে সজলের আনন্দই হয়। কিন্তু যে-মেয়েটা তার পাশে বসে আছে মনে করছে, যাকে সে একা ভাবছে— আসলে সে হয়তো মোটেই একা নয়। বাবুজির অনুচররা তাকে অদৃশ্যে ঘিরে রেখেছে। সজল বলল, চলো উঠি।

একটা গাছের ছায়ায় তারা বসেছিল। ঝুপড়ি মতো গাছ। গাছের ডাল পাতা হাত দিলেই নাগাল পাওয়া যায়। কী ভেবে হঠাৎ মনোরমা চায়ের ভাঁড় নদীর জলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে কী ভেবে নিজের নাম গোটা গোটা অক্ষরে লিখল, তার পর পাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে সজলকে তার নাম লিখতে বলল, মনোরমার নানা পাগলামির সাক্ষী সে। সাময়িক কোনও বিভ্রম থেকে হতে পারে। সেও তার সুন্দর হস্তাক্ষরে পাতায় নিজের নাম লিখল, আর দেখল মনোরমা বটুয়া থেকে কী বের করছে, এবং মুহূর্তে ব্লেড দিয়ে ডান স্তনের ওপরের দিকটায় মৃদু আঁচড় কেটে দিল— সজল পাগলের মতো ঝাঁ মেরে হাত থেকে ব্লেড কেড়ে নিলেও কয়েক ফোঁটা রক্ত পাতায় গড়িয়ে পড়ল। পাতাটা রক্তে ভিজে গেলে মনোরমা শাড়ি দিয়ে স্তন ঢেকে দিল।

সজল হতভম্ব।

এটা কী করলে!

ও কিছু না।

সজল ব্লেড কেড়ে নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল। সে হতভম্ব। বলতেও পারছে না, দেখি দেখি, ব্লাউজ সরিয়ে তো আর দেখা যায় না! মনোরমা বালিকার মতো হেসে দিয়ে বলল, দু' ফোঁটা রক্ত দেখে হতভম্ব হয়ে গেলে! তোমার চেঁচামেচিতে মনুষজন ছুটে আসছে বোকো।

সজল পালাতে পারলে বাঁচে। শেষমেশ যদি মনোরমা কিছু করে বসে! সে কি মনে মনে তৈরি হচ্ছে!

মনোরমার যেন কোনও খেয়ালই নেই। নাম লেখা পাতায় রক্ত মেখে নদীর উঁচু পাড় থেকে কিছু ঝোপজঙ্গল পার হয়ে জলের কাছে নেমে গেল। জলে ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে— মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কী করে বসবে, এই আতঙ্কে সেও তাকে পাগলের মতো অনুসরণ করার সময় দেখল, পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে মনোরমা তাকে ডাকছে।

কী হল, এস না! দেরি করছ কেন। দেখছ না সূর্যাস্ত হচ্ছে।

আসলে সজল জীবনেও এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখীন হয়নি। কুঠিবাড়ি আসলে হানাবাড়ি, কিংবা ভূত প্রেত, পরি কত কিছুই শোনা যায়। মনোরমা কি রক্ত দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছে, সে নারী, সে ভালবাসার কাঙাল! সে পাগলিনী রাধা। সে ডাইনি কিংবা পরি নয়।

ক্রমে সজল কিছুটা উদভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। তার বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে সে। সে দৌড়ে নামছে, তারও দিকবিদিক জ্ঞান নেই। মনোরমা যদি তার আত্মা গচ্ছিত রেখে ডুব দেয়— যেন এই মেয়ের পক্ষে যে কোনও হঠকারি কাজই সম্ভব—

মনোরমা সূর্যাস্তের দিকে চোখ রেখে প্রার্থনার মতো পাতাটা অঞ্জলিবদ্ধ করে বলল, আমার অঞ্জলিতে হাত রাখো ডাক্তার।

সে হাত রাখল।

সূর্যাস্ত দ্যাখ।

সজল সূর্যাস্ত দেখল।

দিন শেষ, আবার নতুন দিনের জন্মের জন্য অপেক্ষা করব আমরা। তুমি আমার পাশে থাকবে।

আমি তো পাশেই আছি তোমার। কেন অযথা পাগলামি করছ বুঝি না। এই এই। কী হচ্ছে! আমি চিৎকার করব, লোকজন ডাকব।

না বলো। সজল তুমি আমার।

আমি তো তোমারই।

বলো, তুমি আমার।

হ্যাঁ, আমি তোমার।

এই সব অর্থহীন অঙ্গীকার কিংবা ভাবালুতাকে সজল গুরুত্ব দিতে চায় না। কারণ প্রেম এক পাগলপারা জলধি, আমি তোমার বললে বড়ই লঘু স্বরে কথা হয়। তবু আপাতত মনোরমাকে খুশি করার জন্য, কারণ মনোরমা যে বড়ই উচাটনে আছে তার জীবনকে নিয়ে, যে কোনও মূল্যেই তাকে স্বাভাবিক করে না তুলতে পারলে এক বিপজ্জনক খেলা শুরু হয়ে যেতে পারে।

মনোরমার নির্দেশ মতোই সে জলে নেমে গেল, তার পর সেই নাম লেখা রক্তাক্ত পাতাটি, নদীর জলে ভাসিয়ে দেবার সময় মনোরমা তার হাত শক্ত করে ধরে ডুব দিল।

তার পর ভিজে জামাকাপড়ে দু'জনেই নদীর পারে বসে থাকল। বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, গরমে এই নদীর জল এবং ঠান্ডা বায়ু দু'জনকেই কেমন প্রফুল্ল দেখাল।

তারা বসে আছে।

সজল বলল, অকারণে এই রক্তপাত, আমার কিছু ভাল লাগছে না মনোরমা। এই নিষ্ঠুরতায় কখনও তুমি ভেসে যাবে ভাবতেই পারিনি।

মনোরমা হেসে দিল, আমার কিছু হয়নি, তাকাও।

জানি না, আমার নিজেরই এখন ডুবে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার তাকাতে ইচ্ছে করছে না, কিছু দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না, রক্ত চোঁয়াচ্ছে মনে হয়।

কিছু হচ্ছে না। হাত দিয়ে দ্যাখো না! নিজে দ্যাখো না ডাক্তার।

ইচ্ছে হল হাত দিয়ে দ্যাখে, তবে নদীর পারে মানুষজন, মনোরমার গোপনীয়তা রক্ষা হবে না, এবং সে তো মনোরমার শরীর চেনে, সে সহজেই পারত, কিন্তু আজ এই দিনে, কারণ নিশ্চয়ই এটি পবিত্র দিন মনোরমার জীবনে, সে না বলে পারল না, এই নদীর জলে পাতা ভাসিয়ে দিয়ে কী পেলে তুমি?

তোমাকে। মা আমার বাবুজিকে, এ ভাবেই জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন, অবশ্য আমার দাদাজি বাবাকে ধরে এনে কালীঘাটে পূজা দেন এবং সেখানেই আমার মা তাঁর স্ত্রী বলে চিহ্নিত হন। বাবা মাকে পুরোহিতের সামনেই সিঁদুর পরিয়ে দেন।

সজল বলল, চলো উঠি। দু'বার মহাবীর এসে ফিরে গেছে। দেরি হলে বাড়িতে চিন্তা করবে তোমার।

চিন্তা! বাদ দাও তো। আমি তো রক্ষিতার মেয়ে।

আবার মাথা খারাপ করছ!

আসলে তখনও যে হিন্দু কোড বিল পাশই হয়নি, মনোরমার দাদাজি তার পুত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসাবে কুমরিকে গ্রহণ করলে কোনও সামাজিক বাধা নিষেধের যে লঙ্ঘন হয় না, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। এবং মনোরমা অর্থাৎ রুমালি পাণ্ডের নামে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উইল করে দিতে অসুবিধা হয়নি।

সজল শুধু বলল, অযথা উত্তেজিত হলে তোমারই ক্ষতি হবে এবং এই ভাবে সে মনোরমার পরিবারের খবরাখবর নিতে গিয়ে প্রশ্ন না করে পারল না, তোমার আর কে কে আছেন।

সে কখনও উত্তর দিত, কখনও দিত না। কখনও বলত, আছে।

তারা কারা?

আমার দুই বৈমাত্রেয় দাদা আছেন শুনেছি। আমি তাঁদের দেখিনি। চিনি না। তাঁরা কী করেন কিছুই জানি না।

মনোরমা এক দিন বলল, জানো, আমি আর সেই স্বপ্নটা দেখি না।

কোন স্বপ্ন।

ওই যে আমলকি গাছটা বালিকা হয়ে যেত, হাত ধরে বেড়াতে যেত।

স্বপ্নটা সুন্দর স্বপ্ন। আমার তো ইচ্ছে হয় এমন সুন্দর স্বপ্ন দেখি। অবশ্য এমন স্বপ্নের কথা আগেও বলেছে মনোরমা।

জানো, আমার কী রাগ হত না! সেই যে মনে আছে, তুমি গাছটার নীচে এসে দাঁড়াতে!

মনে আছে।

আমার কেবল ভয় হত, গাছটা না এক দিন তোমার হাত ধরে কোথাও চলে যায়।

কোথায় যাবে?

কী জানি।

এ সব কথাও বলেছে। আসলে নিরাময় হবার মুখে অনেক কথারই পুনরাবৃত্তি হয়। সজল খুবই ধৈর্য সহকারে শুনত। একান্ত ব্যক্তিগত নিন্দামন্দও সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জানো, আদালতে মামলা ঝুলছে!

তাতে তোমার কী আসে যায় মনোরমা।

না বলছিলাম, আমার বিমাতা কত নিষ্ঠুর। জান, তিনি আমার মাকেও শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন—

ঠিক আছে, তুমি তো চলেই যাচ্ছ।

কোথায়?

কেন পুজাপাঠ হবে, কী সব ব্রত, মৌনি স্নান, পুরনো কাসুন্দি আর নাই ঘাঁটলে। মন খারাপ করে কী লাভ!

আচ্ছা তুমিই বল, আমি রক্ষিতার মেয়ে?

কেন রক্ষিতার মেয়ে হবে। তখনকার আমলে যে কেউ দু'-তিনটে বিয়ে করলেও আইন বিরুদ্ধ ছিল না।

সেই তো। পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের কাছে, আমার মা রক্ষিতা শুধু, হুকাদাদু এক নম্বরের পাজি। সেই তো মাকে খাটো করত সবার কাছে। আমাকে সম্পত্তির ওয়ারিশন থেকে সবাই বঞ্চিত করতে চান, জানো। আমাকে সরিয়ে দিতে পারলেও হয় তো কাজ হাসিল হয় সবার। তবে আমি কিছু ঠিক জানি না। আমাকে কেউ কিছু বলেও না। তুমি আমার পাশে থাকলে আমার আর কী চাইবার আছে বলো।

তার পর হাতে সজলের হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে বলল, তোমাকে ফেলে আমি কোথাও যাব না। কোথাও গেলে একা হয়ে যাব। মনোরমা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

সজল কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে তো মনোরমার কেউ নয়। সে শুধু বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না। এবং বলতে হয় বলে বলা, এবং সজল নিজের মধ্যেই এক ঘোর হাহাকারে ডুবে যেতে থাকল—

এবং সরযূপ্রসাদ যখন এলেন, এখানকার পাট চুকিয়ে যোশীমঠে যাবার জন্য সবাই যখন প্রস্তুত, তখনই টুকিপিসি দৌড়ে এসে খবর দিল, রুমালি অর্থাৎ মনোরমা ঘরে নেই। কোথাও নেই। এক বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণীকে শেষ পর্যন্ত কখন কে যেন অপহরণ করে নিয়ে গেল। এবং চামরি হস্টেলে ডাক্তার সাবের কাছে লোক এসে জানতে পারল, তিনিও নেই। তার ইন্টার্নশিপ শেষ, দেশে চলে যেতে পারেন—অবশ্য দেশে খবর নিয়ে জানা গেছিল, সে সেখানেও যায়নি।